বয়ঃসন্ধি

বাসুদেব দত্তচৌধুরী



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

বয়ঃসন্ধি

[ADOLESCENCE]

বাসুদেব দত্তচৌধুরী

এম. ডি., ডি. সি. পি., পি-এইচ্. ডি.

শারীর বিজ্ঞান বিভাগ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পোষ্টগ্রাজুয়েট

ইন্‌ষ্টিট্যুট অব বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্সেস,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BAYASANDHI

Basudeb Dattachaudhuri

প্রকাশকাল :

আগষ্ট, ১৯৮২

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যানসন (নবম তল)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :

শ্রীসুধাতোষ বসু

ইম্প্রেশন

৩৩বি, মদন মিত্র লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

প্রশান্ত হাজরা

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

অবতরণিকা

বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে অনেকের মত আমারো আগ্রহ অপরিসীম, বিশেষ করে এই সত্তর-আশির দশকে, যখন এই বয়স যে কোনো সচেতন ব্যক্তিকেই ভাবিয়ে তুলেছে। এই বিষয়ে লেখার প্রথম প্রেরণা এলো অগ্রজপ্রতিম ডঃ রথীন্দ্রনাথ নাগ রচিত এক ইংরাজী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার সুযোগে। ইতিপূর্বে অনুসন্ধিৎসাবশে এধার ওধার বিক্ষিপ্তভাবে যে সব তথ্য সংগৃহীত ছিল, তাকেই গ্রথিত করে রচনায় হাত লাগালাম। তথ্য ও তত্ত্বের সংকলন কালে কাচাডুরিয়ানের বইটিও হাতে এসেছে। বুঝেছি এই ধরণের গ্রন্থরচনা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয় এবং তাতে আরো অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

কিন্তু বই লেখার ঝামেলা অনেক। তথ্যের জন্য যেমন ছুটতে হয় গ্রন্থাগারিকদের দরবারে, তত্ত্বের জন্য তেমনি পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হতে হয়। সুখের কথা, কোথাও আমাকে বিমুখ হতে হয় নি। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করাই গ্রন্থনার প্রধান সমস্যা। তাই বিজ্ঞানবিদ্‌দের সংগে সংগে কলাবিদদের অনেকের উপদেশ শিরোধার্য করতে হয়েছে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্মে নিযুক্ত থাকার ফলে আমার সে ব্যাপারে সবিশেষ সুযোগ মিলেছে।

বয়ঃসন্ধির সমস্যা শুধুমাত্র সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক নয় তার পিছনে এই বয়সের যে স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক পরিণতির প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল, শারীরবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে সে জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অধুনাতন প্রচলিত শারীরশাস্ত্রজ্ঞানকে সামাজিক পরিপার্শ্বের সমস্যার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাকে প্রযোজনার দায়িত্ব যাদের, সেইসব শারীরবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধার ও ছাত্র-যুবনেতা সম্প্রদায়ের হাতে এই জ্ঞান ও চেতনার হাতিয়ার তুলে দেওয়া হল।

বিজ্ঞানের কথা বাংলা ভাষায় বলতে গেলে যে সব বিপদের সম্মুখীন এখনো হতে হয়, আমার ক্ষেত্রেও তা বাদ যায়নি—বিশেষ করে সীমিত শব্দ-সঞ্চয়ের জ্ঞান নিয়ে। বিশেষ দুর্ঘট হয়েছে অনেক স্থলে, যেসব জায়গায় ইংরাজীতে চিন্তা করে বাংলায় লিখতে হয়েছে—সেইসব জায়গায় অনুবাদের জড়ত্ব কাটিয়ে ওঠা আমার স্বল্পক্ষমতায় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সুতরাং ভাষা

প্রকাশের অসন্তোষ গ্রন্থকারের সংগে গ্রন্থপাঠককেও ভাগ করে নিতে হবে ক্ষমার মানসিকতা নিয়ে।

পরিভাষা রচনায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে সাহায্য যেমন নিয়েছি, চলতি পাঠ্য-গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষা যেমন ব্যবহার করেছি, তেমনি কিছুক্ষেত্রে স্বরচিত শব্দচয়ন করার স্বাধীনতাও গ্রহণ করেছি। পরিশিষ্ট হিসাবে গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির ইংরাজী প্রতিশব্দ যথাসম্ভব তালিকাভূক্ত করা হল। অনেক ক্ষেত্রে মূল ইংরাজী পরিভাষাও ব্যবহার করেছি, যেখানে উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা অমিল বা অপছন্দ হয়েছে।

তারুণ্য-সমস্যার বিভিন্ন দিকের খবরাখবর সংগ্রহ করতে হয়েছে বিভিন্ন আকরগ্রন্থ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে। গ্রন্থের মূল অবয়বকে কণ্টকিত না করে যথাস্থানে শুধুমাত্র সংখ্যা নির্দেশ করে এবং গ্রন্থশেষে সেই সংখ্যানুযায়ী আকরসূচী সাজিয়ে ঋণ স্বীকার করার প্রয়াস নিয়েছি।

যারা বিষয় বেছে পড়তে চান বা প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়ের উপর চোখ বুলিয়ে নিতে চান, তাদের সুবিধার্থে একটা মোটামুটি বিষয় নির্দেশিকা গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ্রন্থরচনাকালে বহু হিতৈষী শুভানুধ্যায়ী সমাধ্যায়ীদের সাহায্য পেয়েছি, বিশেষ করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের। আলাদা করে নাম করতে গেলে সে এক বিরাট তালিকা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সে চেষ্টা না করে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন নিজ মনেই রাখছি। তবে তথ্যের বিভিন্ন অংশে সক্রিয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন যুবনেতা শ্রীনিবাস বসু ও জহর চৌধুরী, এডভোকেট আশীষকুমার বক্সী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ দপ্তরের জনসংযোগ অধিকারিক সৌমিত্র লাহিড়ী, কর্মবিনিয়োগ আধিকারিক বিলাসরঞ্জন রায় ও আমার অগ্রজতুল্য সমাধ্যায়ী শারীরস্থানবিদ্ ডাঃ অসীম কুমার দত্ত। পাণ্ডুলিপি নকল করে যারা আমার ডাক্তারী 'দেবাক্ষর'কে মুদ্রাকরবোধ্য 'দেব্যক্ষরে' পরিণত করার আয়াস নিয়েছেন, এই অবসরে সেই শ্রীমতীত্রয় মঞ্জু-ছন্দা-শ্রবণাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগে বিষয়কে সহজবোধ্য করার জন্য যে ছবিগুলি ব্যবহার করেছি, সেগুলিকে আমার ধারণানুযায়ী সঠিক চিত্রিত করার জন্য দায়ী শিল্পী অনুজপ্রতিম অসীমকুমার মাইতি ও সুশান্ত সিংহরায় ধন্যবাদভাজন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়ে যথাযথ সংশোধনের উপদেশ দিয়েছেন কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত-অধ্যাপক ডঃ চণ্ডীচরণ দেব, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ রবীন্দু গুপ্ত ও প্রখ্যাত প্রকাশক-সম্পাদক নির্মল চন্দ্র শীল—এই তিন গুণীর বহু শ্রম ও সময়ের অপব্যবহারের পূরণ শুধুমাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপনেই সম্ভব নয় একথা জানি।

এই অকিঞ্চিৎকর রচনাকে মূল্য দিয়ে যারা এর প্রকাশনভার গ্রহণ করার গুরুদায়িত্ব নিলেন সেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের কর্ণধার অধ্যাপক দিবেন্দু হোতা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধলেন। আর, আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে মুদ্রাকর "ইমপ্রেশন"-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দের আয়াসবহুল আন্তরিকতা—তাঁদের প্রভূত পরিশ্রমের ফলে গ্রন্থটি যথাসম্ভব মুদ্রাকর-প্রমাদ-মুক্ত হতে পেরেছে। মুদ্রণসময়ে আগাগোড়া প্রুফসংশোধনের ভার নিয়ে অনুজ শ্রীমান বিশ্বদেবও আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করেছে।

সবশেষে যাদের জন্য এই বই লেখা, তারা উদ্দীপিত হলে আমার শ্রম সফল হয়েছে বলে নিজের কাছে নিজেই কৃতজ্ঞ হয়ে উঠবো বলে আশা রাখি। আর ভরসা রাখি, সমাধ্যায়ীদের সমালোচনায় ভবিষ্যতে গ্রন্থটি আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

রাখীপূর্ণিমা। ১৯৮২

শারীরবৃত্ত বিভাগ

বাসুদেব দত্তচৌধুরী

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পোষ্ট-গ্রাজুয়েট
ইনষ্টিট্যুট অব বেসিক মেডিকেল সায়ান্সেস।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্রসূচী

১

উপক্রমণিকা

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"[১]—ডাক দিয়েছেন কবি 'দুরন্ত' 'জীবন্ত' 'অশান্ত' 'প্রচণ্ড' 'প্রমত্ত' 'প্রমুক্ত' তারুণ্যশক্তিকে। কিম্বা কবি তারস্বরে কামনা করেছেন—"এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।"[২] প্রতিযুগেই কবিরা গেয়েছেন তারুণ্যের জয়গান। কারণ ঐ শক্তির অপ্রতিরোধ্যতাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু এতো গেল কবিতায় উচ্ছ্বাসে গাওয়া জয়গান। বাস্তবে তো দেখা যায় এইসব 'সবুজ-অবুঝ'দের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছাড়া কথা বলে না কেউ। তাই দেখি যে কবি তারুণ্যকে সাদরে আহ্বান জানান কবিতার ভাষায়, তিনিই যখন আবার বাস্তবের গদ্যতে নেমে আসেন, তখন বলেন—"এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজে লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানান রূপে বাড়িয়া ওঠে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়। কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।"[৩]

বয়ঃসন্ধির কিশোর সম্বন্ধে এই বাস্তব অনুভূতি প্রায় সকলেরই। বয়স্ক সমাজের কাছে প্রতিযুগেই "আজকালকার ছেলে" কথাটা যেন স্বতই অবজ্ঞা-প্রসূত উক্তি। ডাইনে-বাঁয়ে কান পেতে শুনুন কেবল 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের' সম্বন্ধে নানান বক্রোক্তি—তাদের সাজ-পোষাকের ফ্যাশন থেকে তাদের বাচন-ভংগী আচার-আচরণের বিরূপ সমালোচনা। অথচ আজকে যারা "আজকালকার ছেলে", আগামীকাল তাঁরাই আবার বাঁকা চোখে ঠোঁট বেঁকিয়ে পরবর্তী যুগের তরুণদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবেন—"আজকালকার ছেলে"।

অথচ এই তারুণ্যশক্তিকে এড়িয়ে সমাজে কিছু ভাবার বা করার উপায়

নেই। সেই উনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল থেকে বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের পুরোধা ছাত্রসমাজ, এমনকি বর্তমান ভারতে যুব-সমাজের প্রচণ্ড আলোড়ন—যার প্রকাশ 'নকশাল' থেকে 'আসু'—এই সব পটভূমিকায় বিচার করলে দেখা যাবে বয়ঃসন্ধির সেই কবিকথিত 'প্রমত্ত' 'প্রচণ্ড' অপ্রতিরোধ্য রূপ। তাই বোধ হয় ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই প্রবুদ্ধ নেতৃত্বকে খুলতে হয়েছে দলীয় যুবফ্রন্ট। মনে না হলেও মুখে বলতে হচ্ছে—তোমরাই আগুয়ান শক্তি। কারণ, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তন—তা সে গঠনেই হোক আর ভাঙনেই হোক—এই তারুণ্যের তোড়েই হয়ে থাকে—ইতিহাস তাই বলে। তাই কেউ যখন Teen-age-কে বানান ভুল ক'রে Tin-edge লিখে ফেলেন—তা তাদের অবচেতন মনের ভাবের প্রকাশ মাত্র। কারণ বয়ঃসন্ধির তীব্রতা অনস্বীকার্য।

এই যে তারুণ্য শক্তি—যাকে adolescence বা teen-age বা বয়ঃসন্ধি অভিধা দেওয়া হয়ে থাকে—তাকে নিয়ে কাব্যিক উচ্ছ্বাস হয়েছে, বিদ্বেষজাত ব্যংগোক্তি হয়েছে, ভীতিবিহ্বলতা-প্রসূত উপদেশ বর্ষণ হয়েছে অনেক, কিন্তু কোন সুষ্ঠু চিন্তা হয়নি। সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই বয়ঃসন্ধির তরুণদের নিয়ে তেমন গঠনমূলক পরিকল্পনা হয়নি।

বয়ঃসন্ধি যে শুধু একটা ভাবগত পরিবর্তন নয়—বস্তুতান্ত্রিক রূপান্তর, শুধুমাত্র মানসিক নয়—তার পিছনে থাকে বিরাট শারীরিক বিকাশবিবর্তন—এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব আলোচনার প্রয়াস এই গ্রন্থে। অন্তত এই ধারার বৈজ্ঞানিক চিন্তা বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার সৃষ্টি করলে তারুণ্যশক্তির যথাযথ নিয়োগ ও প্রয়োগের চিন্তার জন্মও হতে পারে। অন্তত একটা বস্তুতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে এক সংবেদনশীল মনোভাব জাগরূক হোক—গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য সেটাই।

২

বয়ঃসন্ধি ও সমাজ

পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও উন্নত দুই সমাজেই যুব সমাজের ভূমিকা উত্তরোত্তর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। দেহে-মনে বর্ধনশীল এই নবীন সমাজকে মানি বা না মানি, এর চাপ ক্রমশই সমাজের প্রবীণ নেতাদের ভাবিয়ে তুলছে। সংখ্যার দিক থেকেও বয়ঃসন্ধি-সমাজ পূরো সমাজের এতখানি অধিকার করে আছে যে গোষ্ঠী হিসাবেও প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে।

বয়ঃসন্ধির পরিসংখ্যান ঃ সংখ্যার দিক থেকে কিশোরসমাজ আমাদের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অধিকার করে রয়েছে। ১৯৭১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের বয়ঃসন্ধির জনসংখ্যা ১১,৫৬,৮৭, ৬০০ ; তার মধ্যে কিশোরের সংখ্যা ৬,১৫,২১,৭০০ এবং কিশোরীর সংখ্যা ৫,৪২,৬৫,৯০০। এবং এই দ্বিতীয় দশকের বয়সীরা প্রায় ২১ শতাংশ জুড়ে জনসমাজে বাস করছে।

১৯৭৬ সালে ওয়াশিংটনের পপুলেশন রিসার্চ ব্যুরোর বিবরণে দেখা যায় পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪০০ কোটি, যার মধ্যে ১৫ বছরের কমবয়সীদের সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৭৬ সালের মোট জনসংখ্যা ২১,৫৬, ৫৩,০০০এর মধ্যে ১০ থেকে ২০ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৪,৫২,১২,০০০—অর্থাৎ দ্বিতীয় দশকের বয়সে রয়েছে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ২০·৯ শতাংশ। এই যুব জনসংখ্যার মধ্যে কিশোরের সংখ্যা ৫০·৪ শতাংশ এবং কিশোরীর সংখ্যা ৪৯·২ শতাংশ। ১৯৪০ সালের পর থেকে যুদ্ধোত্তরকালে আমেরিকায় যুবসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সমগ্র জনসমষ্টির ৩৪·৪ শতাংশ ছিল প্রাক-বিংশ বয়সের ১৯৪০ সালে, আর ১৯৬০ সালে ঐ অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৩৮·৯ শতাংশে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল—এই দুই দশকে টিন-এজারদের সংখ্যা প্রায় ৮১ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাজ্যেও ১৯৬৭ সালের সমগ্র জনসংখ্যার ২৯·৩ শতাংশ এই বয়ঃগোষ্ঠির অন্তর্গত।

উন্নত দেশগুলির চাইতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বভাবতই বয়ঃসন্ধির জনসংখ্যা বেশী হয়ে থাকে। তাহলে ভারতের সত্তর কোটি লোকসংখ্যার মধ্যে যুব সমাজের সংখ্যাশক্তি কত হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর, এই সংখ্যার

প্রভাব সমাজকে কতটা নিয়ন্ত্রিত করবে তার ধারণা করা খুব কল্পনাশক্তির অপেক্ষা রাখেনা।

বয়ঃসন্ধির পরিবার ও সমাজ ঃ বর্তমান যুবসমাজ এক ধারাবাহিক প্রণালীর মধ্যে বেড়ে উঠছে। প্রণালীগুলির প্রধান হ'ল তার ঘর ও পরিবার, শিক্ষাস্থান, স্বাস্থ্যপ্রযত্ন, কর্মস্থল, নিয়মানুবর্তিতা ও প্রশাসনানুবর্তিতা আর ধর্মপ্রকরণ। এই প্রণালীগুলির একটির পরিবর্তন অন্যগুলির ওপর প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে এবং বহুভাবেই এই ধারাবাহিক সংঘাত আসতে পারে।

যুবসমাজের আয়তন এবং তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও সংগতি, এ-সব কিছু সমাজের বাকী অংশের উপরে প্রভাব প্রতিফলিত করে। মনে রাখা দরকার, প্রতিটি কিশোর-কিশোরীই এক অনুপম ব্যক্তিত্ব যা কিনা এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বয়ঃসন্ধির শেষভাগে যুবমানসের আবেগপ্রবণতা, বোধ ও অবধারণার তীব্রতা সমাজকে সজাগ করে তোলে এই কৈশোর-সমাজ সম্পর্কে। এই বয়সে জীবনের ধারা নির্ধারণের জন্য ছেলেমেয়েরা যখন কলেজে বা প্রযুক্তিশিক্ষালয়ে বা জীবিকায় প্রবেশে সচেষ্ট হয়, যখন সে দাবী করে, "শিক্ষাসংস্কৃতির জ্ঞানবিজ্ঞানের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ হবে প্রসারিত এবং যুবসমাজের বহুমুখী সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পথে অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা হবে অপসারিত"[৫], তখন তাদের পরিবার ও সমাজ আগের চেয়ে সূক্ষ্মতর বিচারে রত হয়। অপরপক্ষে, বয়ঃসন্ধিসুলভ তীব্র আত্মবোধ, স্বত্বপ্রতিষ্ঠামুখিতা ও আত্ম-আবিষ্কারের প্রেরণায় এই যুবসমাজ বয়স্ক সমাজকেও সমালোচনা করে থাকে। এই বয়ঃস্তরে যখন তারুণ্যের নতুনতর জীবন ও ধ্যানধারণার পদক্ষেপ ঘটছে, তরুণমানস তখন বয়স্কসমাজের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে সমাজকে অপছন্দ করতে থাকে, তখন তারা বয়স্ক-সমাজকে তর্জনী তুলে বলে, "বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাদের মধ্যে অনেক মিথ্যে, অজস্র ফাঁকি, অসংখ্য গোঁজামিল ও অগুণতি অসততা আবিষ্কার করি, এবং বুঝতে পারি এই বিশ্বব্যাপী মিথ্যে ফাঁকি গোঁজামিল অসততা থেকে রেহাই নেই আমাদের।"[৬] আর এই অপছন্দ করার প্রবণতা বাড়তে বাড়তে যুবসংস্কৃতির সংগে বাকী সমাজের সংস্কৃতির এক তীব্র বিরোধ জন্মায়, আর এই অহেতুক বিরোধ থেকে জন্মায় এক অহেতুক ঘৃণা। তরুণ সমাজ তখন চিৎকার করে ব'লে ওঠে, "আমরা কেবল ওদের বর্জন করতে পারি। দেখিয়ে দিতে

পারি, আমরা ওদের মানি না, ওদের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, জীবনদর্শন, আমরা মানি না।"[৬] তাদের এই না-মানার প্রতিচ্ছবি পাই খবরের কাগজের পাতায় পাতায়।

কিন্তু বয়স্ক সমাজ তো অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং পরিণত। তাই এই প্রবীণ সমাজেরই তো উচিত ঐ অর্বাচীন সমাজের অপরিণত অথচ অনড় ধ্যানধারণাগুলিকে সহানুভূতির সংগে সুবিবেচনা করে তারুণ্যের ঐ বিক্ষোভ, ঐ ঘৃণা, ঐ একগুঁয়েমিকে প্রশমিত করার চেষ্টা করা।

বয়ঃসন্ধি ও রাজনীতি ঃ সম্প্রতি পৃথিবীর বয়স্ক সমাজের চিন্তাভাবনা সুরু হয়েছে রাজনীতিক্ষেত্রে তারুণ্যশক্তির কি ভূমিকা হবে তাই নিয়ে। যখন অধিকাংশ শিক্ষানীতিবিদ ও সমাজহিতৈষীর দল ছাত্রদের রাজনীতি করার বিপক্ষে সোচ্চার হয়েছেন, তখন আর একদলের মত হ'ল, "বস্তুত ছাত্রদের রাজনীতি করতে না বলাটাই একটা রাজনীতি।"[৭] কেননা, "রাজনীতি এড়িয়ে চলা অসম্ভব। সামাজিক পরিবর্তনের মূল প্রভাব রাজনীতি। পরিবর্তন কোন পথে যাবে, তাতে লাভ হবে কার, কার হবে না, তার নির্ধারক রাজনীতি। বিজ্ঞান টেকনোলজি সামাজিক পরিবর্তনের মালমশলা, তার নিয়োগকর্তা হ'ল রাজনৈতিক নেতৃত্ব।"[৬]

বয়ঃসন্ধির অধিকাংশই কিন্তু রাজনীতি ব্যাপারে মানসিকভাবে অনাসক্ত থাকে তাদের স্বভাবলাজুকতার জন্য। তাছাড়া তারা তাদের ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে এইদিকে তাদের প্রবণতা বস্তুত কমই হয়ে থাকে। কিন্তু এই কিশোর-কিশোরীর দল যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজেদের ফলপ্রসূ হতে দেখে, তাহলে তাদের সেই সাফল্য তাদেরকে রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণে নববলে বলীয়ান করে তোলে।[৭]

ষাটের দশকের শেষভাগে ফ্রান্সে রাজশক্তির ভিত আলগা করে দিয়েছিল ক্ষিপ্ত যুবশক্তির চমকপ্রদ প্রতিবাদ। ভীয়েৎনামের যুদ্ধের প্রতিবাদে মার্কিন যুবমানস হ'ল উদ্বেলিত, দাবী তুললো যুদ্ধপ্রস্তুতির গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও নির্বাসিত হ'ক। চেকোস্লোভাকিয়ায় বিদ্রোহের বেশীর ভাগ ইন্ধনই জুগিয়েছিল যুবসমাজ। জাপানের তারুণ্য বেরিয়ে পড়লো রাস্তায় ময়দানে সামাজিক পরিবর্তনের দাবী নিয়ে। সমসময়ে চীনে শুরু হ'ল সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর ভারতে বিস্ফোরণ ঘটলো নকশাল আন্দোলনের। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের ১৯৮০-৮১ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৮, ১৯৭৯ ও

১৯৮০ সালে সারা দেশে যথাক্রমে ৯,১৭৪টি, ৯,২০০টি এবং ১০,৬০০টি ছাত্রবিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে।

পণ্ডিতেরা একবাক্যে সনাক্ত করেছেন যে, বিশ্বমানব-রণাঙ্গনে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যার নাম "ইয়ুথ পাওয়ার"। এই ইয়ুথ-পাওয়ার বা তারুণ্যশক্তি তাদের সাফল্যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর অত্যুৎসাহী অংশীদার হয়ে উঠতে চাইলো, এবং এই সুযোগে বয়স্ক রাজনীতিকের দল এই তারুণ্যশক্তিকে এক্সপ্লয়েট করতে শুরু করলেন। কারণ তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তাঁরা জানেন, এই যুবসমাজ সমাজের কোনো স্থায়ী শ্রেণী নয়, এদের বিদ্রোহ চিরকালই শিকড়বিহীন বিস্ফোরণ—আজ আছে কাল নেই। তাই প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলিই গড়ে ফেলেন 'যুবফ্রন্ট'—আর পরস্পরের সংগে লাগিয়ে দেন বিসম্বাদ। যুবজনের রাজনীতি তাই হয়ে ওঠে হানাহানির রাজনীতি। দলীয় মারামারি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আর উচ্চাকাংখার জন্য খুনোখুনি—সত্তর-আশির দশকের যে কোনদিনের সংবাদপত্র খুললেই বিস্ফোরিত যুবসমাজের এই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। অথচ পরস্পর-বিরোধী এইসব যুবসংগঠনের ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য কিন্তু মোটামুটি এক। "দায়িত্বশীল ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও মানসিক উন্নয়নের চেষ্টা করা"[৫] যেমন একদলের ফতোয়ায় ঘোষিত, তেমনি তার বিরোধী এক যুবদলের ঘোষণায় দেখতে পাচ্ছি যে তাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য হ'ল—"To organise the youth of India, to train them in the duties and rights of citizenship, to enable them to make positive and constructive contribution towards the realisation of the ideals of a secular democratic state"[৮] অথবা "enthuse them to take due place in the great task of national advancement befitting the glorious tradition and heritage of our mother-land"[৯] বোদ্ধাজন তফাৎ খুঁজে বার করুন তো এই দুই দলের ঘোষণার মধ্যে বিরোধটা কোথায়? তার জন্য গবেষণা করতে হবে!

আর শুধু এদেশে একালেই বা কেন, সর্বদেশে সর্বকালেই রাজনীতিকরা যুবশক্তির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করেন। হিটলারও তারুণ্যশক্তির কাঁধে চেপে রাজদণ্ড অধিকার করেছিলেন। "যে কোনও একজন ক্ষমতোন্মাদ অসম্ভব



বিস্ফোরিত বয়ঃসন্ধির সাংবাদিক প্রতিচ্ছবি

ব্যক্তিত্বশালী স্বপ্নমশালধারী মানুষকে নরমুণ্ডের পিরামিডের চূড়োর চেয়ারে বসানোর জন্য তাদের সর্বস্ব সঁপে দেয় দেশে দেশে কত অমল সরল কিশোর।"[১০] বয়স্ক নেতৃত্ব কোথায় বয়ঃসন্ধির অমিতশক্তিকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করে অভিজ্ঞতার ভাগ দেবেন, তা না করে শুধুমাত্র তারুণ্যশক্তির উচ্ছ্বাসকেই কাজে লাগিয়েছেন। পথ দেখাবার আলো পরিণত হয়েছে ভয়ানক মশালের আগুনে। তাইতো এক যুবনেতাকে সখেদে বলতে শুনি, "প্রগতির জন্য চাই সব মতের যুব সমাজকে সংগঠিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা কিছুতেই চান না যে সকল শ্রেণীর যুবসমাজ এক হয়ে কাজ করুক। যুবসমাজের মনে যদি এই চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে তাহলে কাজ হবে।"[১১]

রাজনীতিক্ষেত্রে উচ্চাকাংখী তরুণের তাই দুই গতি—বয়ঃজ্যেষ্ঠদের তাঁবেদারী করে নিজেকে নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, নতুবা শোষিত তরুণ-সমাজের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বয়স্কসমাজের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া। সুতরাং তাঁবেদার ও বিরোধীদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে আর তার থেকে ফয়দা ওঠাবে শোষক বয়স্ক নেতৃত্ব। কিন্তু সম্ভাবনাময় তারুণ্যশক্তিকে রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নে চেতনশীল করে তুলতে পারলে সমাজের সমগ্র অগ্রগতি দ্রুততর হয়—এচিন্তা আজ প্রবীণ নেতৃত্বের করা দরকার হয়ে পড়েছে।

বয়ঃসন্ধির মস্তানী ঃ বয়ঃসন্ধিকালে কেউ কেউ তার শেখা আদর্শ আর দেখা বাস্তবের মধ্যে বৈষম্য আবিষ্কার করে দারুণভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়ে আর হতাশায় ভোগে। তারা মনে করে যে তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। সমাজের সম্বন্ধে তারা প্রত্যক্ষ শ্রদ্ধাপোষণ করতে অপারগ হয়। বয়স্ক-সমাজের উদ্দেশ্যে মনে মনে বলে, "অনুচ্চারিত অশ্রদ্ধা নিয়ে আমাদের রোজ চলতে হয়। আমরা তোমাদের তৈরী প্রায় কোনো কিছুকেই শ্রদ্ধা করি না।"[৬] এই অনুচ্চারিত অশ্রদ্ধা নিয়ে কিছু কালের মধ্যে অনেকে তাই অসন্তোষের প্রকাশ হিসাবে বিক্ষোভ, মারদাংগা ইত্যাদি অসামাজিক চরমপন্থার অনুসরণ ক'রে সমাজবিরোধী মস্তানে পরিণত হয়। মস্তান তরুণ তখন হয়ে দাঁড়ায় এক সামাজিক সমস্যা। যথার্থ সমবেদী সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব না পেলে বয়ঃসন্ধির মস্তানী সমাজ তথা দেশকে কেমন করে পংগু ও ক্ষতিগ্রস্ত করে সে বিষয়ে আলোচনা পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে বিশদভাবে করা যাবে।

৩

বয়ঃসন্ধির সংজ্ঞা নিরূপণ

বয়ঃসন্ধি হল "শৈশব ও যৌবনের মেলন সময়"[১২] অর্থাৎ কিনা যে বয়সে "সৈসব জোবন দরসন ভেল, দুহু দলবলে দন্দ পড়ি গেল"।[১৩] বয়ঃসন্ধির যথার্থ ইংরাজী প্রতিশব্দ হল Adolescence যার অর্থ "State or process of growing up from childhood to manhood or womanhood; youth or the period of life between puberty and maturity."[১৪] এই 'Adolescence' কথাটি এসেছে ল্যাটিন 'adolescere' থেকে যার মানে হল 'গঠন বর্ধন'।

বয়ঃসন্ধির সংগে প্রায়শই জড়ানো হয়ে থাকে puberty কথাটাকে। অভিধানে এই শব্দটির মানে—"the earliest age at which persons are capable of begetting or bearing children, usually considered in temparate climates, to be about 14 years in males and 12 years in females."[১৪] এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'pubescere' থেকে যার অর্থ হল "চুলে ঢাকা"—অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালীন কিছু লক্ষণকে ধরে এই বয়ঃকালকে নির্দেশিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র puberty বা জননজীবনের শুরুকে বয়ঃসন্ধি বা adolescence আখ্যা দেওয়া সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই বয়ঃসন্ধিকালকে যদি 'কৈশোর' আখ্যা দেওয়া যায়, সেই কৈশোরের সংজ্ঞা হল "যৌবনের পূর্ববর্তীকাল অর্থাৎ দশমবর্ষ হইতে পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত বয়ঃকাল"।[১২] স্মৃতিমতেও সেই সংজ্ঞা মেলে—"দশম বর্ষোত্তর পঞ্চদশবর্ষাবধি"।[১৫] ইংরাজী মতে অবশ্য "generally considered to be in the male sex from 14 to 25 years of age and in the female sex from 12 to 21 years."[১৪]

বহুকাল ধরেই এই বয়ঃসন্ধিকে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হিসাবে ধরে বয়োনির্দেশ করার চেষ্টা হয়েছে। সুশ্রুতের[১৬] মতে বয়ঃসন্ধি হল শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণের কাল—যেন কতকটা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংগে সমতা রেখে। প্লেটো-ও[১৭] সেই ধারণা থেকে বয়ঃসন্ধিকালে যুক্তিবোধের বিকাশ লক্ষ্য করে সেই মত শিক্ষা পদ্ধতির উপদেশ দিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীর যাজক শিক্ষাবিদ

কমেনিয়াস[১৮] সমগ্র বয়োবিকাশের কালকে চারভাগে ভাগ করেছেন, যার তৃতীয় ভাগটি (১২-১৮ বৎসর) বয়ঃসন্ধির সংগে কতক মেলে।

বয়ঃসন্ধি বা adolescence সম্পর্কে আধুনিক ধারণার জন্মদাতা ষ্ট্যান্‌লি হল[১৯] ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের সংগে সমতা রেখে এই বয়সকে মনুষ্য-জাতির বিবর্তনের savagery বা বন্যতা-স্তরের সংগে তুলনা করেছেন। মনুষ্যসমাজ যেমন বর্বরতা-স্তরের মধ্য দিয়ে সভ্যতায় প্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনি যে কোনো ব্যক্তিই বর্বরস্বভাবসম্পন্ন এই কৈশোরের স্তর পার হয়ে স্থিতধী যৌবনে পদার্পণ করে। অবশ্য এ ধারণারও বিপরীত মত আছে যারা ধারণা করেন বয়ঃসন্ধির ঝড়ো আচরণ তার বয়সের মধ্যে নিহিত নয়, নিহিত আছে দেশকালনির্ভর সমাজ-সংস্কারের মধ্যে।[২০]

ভারতবর্ষে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিপক্বতার বয়স হল আঠারো বছর[২১] যদিও মতদানের বয়স এখনও একুশ বছরে নির্ধারিত,[২২] এবং এই বয়স বয়ঃসন্ধিকালের অন্তবর্তী।

দেখা যাচ্ছে, এই সন্ধিক্ষণ শুধু একটা স্থির বয়স নয়—আসলে একটা প্রসারিত বয়ঃক্রম পর্যায়। পাশ্চাত্যমতে বয়ঃসন্ধিকালকে নির্দেশিত করা হয়ে থাকে চলতি কথায় 'teen age' বলে—যে সংজ্ঞা তের থেকে উনিশ বৎসর বয়সকে নির্দিষ্ট করে। তাই আলোচনার সুবিধার্থে প্রাচীন সুশ্রুতমত ও সর্বাধুনিক চলতি আমেরিকান ধারাকে ধরে দশ থেকে কুড়ি বৎসরকে অর্থাৎ জীবনের দ্বিতীয় দশককে বয়ঃসন্ধিকাল বলে ধরাই সমীচীন হবে।

৪

বয়ঃসন্ধিকালে বয়ঃনির্ধারণ

বয়ঃসন্ধি যখন একটি স্থির বয়স নয়—এক বয়ঃক্রমের প্রশস্তকাল—তখন স্বভাবতই এই বয়ঃক্রমে নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণের প্রশ্নটা এসে পড়ে। বিশেষ করে এই বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ বিশেষ বয়সে আইনের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে, যেমন মতদানের ব্যাপারে[২২], বিশেষ করে বিবাহ প্রসংগে[২৩], বা স্ব-অভিভাবকত্ব অবলম্বনের ক্ষেত্রে[২১], বা কর্মবিনিয়োগের ক্ষেত্রে।[২৪] তাছাড়া এই বয়ঃক্রমে খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শরীরতত্ত্বসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

দেহগঠনের শারীরতাত্ত্বিক জ্ঞান অনুযায়ী বয়স নির্ধারণ তিন উপায়ে করা যেতে পারে—(১) উচ্চতা ও ওজন দিয়ে ; (২) দন্তোদ্গমের ক্রম হিসাব করে ; আর (৩) দেহাস্থিগুলির রঞ্জন-ছায়ার বিচার করে।

উচ্চতা ও ওজন বয়ঃক্রমের সংগে তাল রেখে পরিবর্তিত হয়। বয়ঃসন্ধিকাল স্বভাবত দেহের বৃদ্ধির সময়, আর এই বৃদ্ধি হয় উচ্চতায় আর ওজনে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে জনে জনে এত ইতরবিশেষ হয় নানা প্রাকৃতিক কারণে যে শুধুমাত্র উচ্চতা ও ওজন দেখে বয়োনির্ধারণ প্রতিক্ষেত্রেই ভুল হতে বাধ্য। তাছাড়া অন্যান্য দেশের মতো বয়ঃক্রম অনুযায়ী উচ্চতা-ওজনের এক সর্বজন-গ্রাহ্য তালিকা আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী নেই। ফলত এই হিসাব ধরে বয়ঃনিরূপণ খুব একটা যুক্তিযুক্ত হবে না।

দাঁতের সংখ্যা ও কোন কোন দাঁত উঠেছে এই দেখে সতের থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত বয়স স্থির করা সম্ভব। দন্তোদ্গম মনুষ্য জীবনে দু'বার হয়। শৈশবে যে দুধে-দাঁত ওঠে তা শৈশবেই পড়ে যায়। ঐ দুধে-দাঁতের জায়গায় পাঁচ, সাড়ে পাঁচ বছর বয়স থেকে ক্রমে ক্রমে স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে মাড়ি ভেদ করে। স্থায়ী দাঁতের মধ্যে সর্বপ্রথম ওঠে প্রথম পেশক (molar) দাঁত। বছর দশেক বয়সে মোটামুটি ওপরের মাড়ির দুটি পেশক, দুটি কৃন্তক (incisor) এবং নীচের মাড়ির দুটি কৃন্তক ও দুটি পেশক ওঠা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর এগার বছরের মাথায় ওপরের ও নীচের মাড়ির প্রথম চর্বক (premolar), সাড়ে এগার বছরে ছেদক বা শ্বদন্ত (canine) এবং বারো বছরের মাথায় উভয়

মাড়ির দ্বিতীয় চর্বক ওঠে।[২৫] একুশ বছরের মধ্যেই স্থায়ী দন্তোদ্গম সমাধা হওয়াই সাধারণ নিয়ম। তবে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে এক তৃতীয় পেশক বা আক্কেল দাঁত (wisdom tooth) ওঠার ব্যাপারে—এই আক্কেল দাঁত উঠতে সময় সময় চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স পেরিয়ে যায়, এমন কি সারাজীবনেও না উঠতে পারে।[২৬]

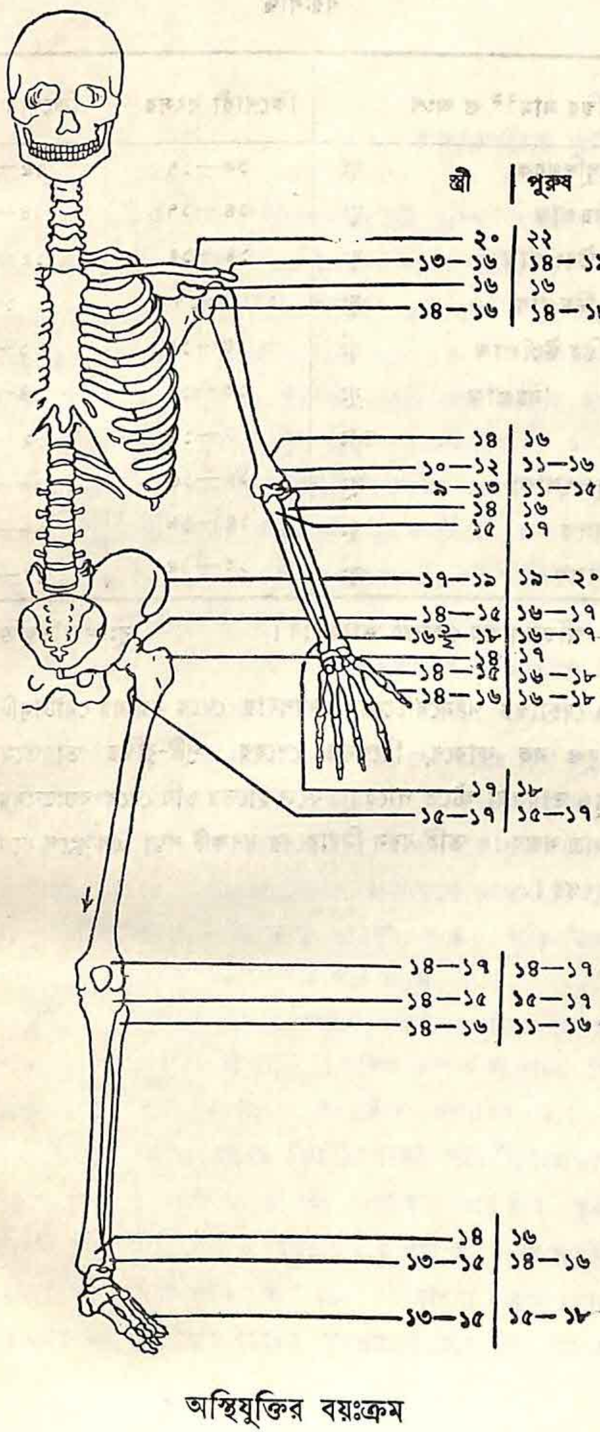
দেহের হাড়গুলো জন্ম থেকেই স্বচেহারায় থাকলেও মূলতঃ তার গঠন থাকে তরুণাস্থির এবং এই তরুণাস্থির ওপর ক্যালসিয়াম প্রমুখ খনিজপদার্থের উপস্থাপনের ফলে হয় ঐ তরুণাস্থিগুলির অস্থিরূপান্তর (ossification)। বিভিন্ন হাড়ে অস্থিরূপান্তরের কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে বিভিন্ন বয়ঃক্রমে। দেহের বৃদ্ধির অংশ হিসাবে হাত-পায়ের হাড়গুলো লম্বায় বাড়ে, আর সেটা সম্ভব হয় ঐসব হাড়ের প্রান্তভাগে যে প্রান্তীয় তরুণাস্থি বা এপিফিসিস (epiphysis) থাকে, তার বৃদ্ধির ফলে। হাড়ের বাড় শেষ হবার সময়ে এই এপিফিসিসগুলো মূল হাড়ের (diaphysis বা shaft) সংগে জুড়ে যায়, আর এই জোড়ন বিভিন্ন হাড়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সে ঘটে থাকে। সুতরাং কোথায় কখন ঐ ডায়াফিসিস আর এপিফিসিস জুড়লো কি জুড়লো না দেখে বয়স নিরূপণ করা সম্ভব।

অস্থিরূপান্তর কেন্দ্রের (ossification centre) আবির্ভাব ও মূল অস্থির সংগে যুক্ত হওয়ার ছবি মেলে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে। হাড়ের যে যে অংশে খনিজপদার্থ জমা প'ড়ে অস্থিরূপান্তর ঘটে গেছে তা রঞ্জনরশ্মি ভেদ করতে পারে না, আর যেখানে ঐ রূপান্তর ঘটেনি সেখান দিয়ে রশ্মি সহজেই ভেদ করে যায়। সুতরাং রঞ্জন-রশ্মি-ছায়ায় ঐ তফাৎ দেখে কোথায় কোথায় অস্থিরূপান্তর কেন্দ্রের আবির্ভাব হ'ল আর কোথায় কোথায় হাড়ের মূল ও প্রান্ত জুড়ে গেল তা নির্ধারণ করে বয়স স্থির করা সম্ভব। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীর হাত-পায়ের হাড়ের ছবি দেখে বয়স সম্বন্ধে মতামত দেওয়া যেতে পারে।[২৭]

এই ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত এই যে ভারতবাসীদের অস্থিযুক্তি (union of epiphysis) য়ুরোপীয়দের থেকে দু'তিন বছর আগে হয়ে থাকে, আর আমেরিকাবাসী বা অষ্ট্রেলীয়দের থেকে পরে হ'য়ে থাকে। অবশ্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই অস্থিরূপান্তর ও অস্থিযুক্তির বিভিন্নতা দেখা গেছে। তবে এটা স্থির যে সব দেশেই পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকদের প্রায় দু'বছর আগেই অস্থিযুক্তি ঘটে থাকে।[২৭]

হাড়ের রঞ্জনছায়া থেকে বয়স নির্ধারণ ব্যাপারে বহু পর্যবেক্ষকের বিবরণ আছে। এই সব বিবরণে অল্পবিস্তর বিভেদ থাকলেও, তাদের যে কোন একটি অনুসরণ করে বয়স স্থির করলে ভুলের পরিমাণ বড় জোর তিন বছরের আগু-পিছু হতে পারে। এই রকম এক পর্যবেক্ষকের তৈরী তালিকা[২৮] উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হল—

অস্থির নাম[২৯] ও অংশ		কিশোরী বৎসর	কিশোর বৎসর
অক্ষক	আঃ	১৭—১৬	১৫—১৯
	যুঃ	২০	২২
অংসতুণ্ডের ডগা	আঃ	১০—১১	১০—১১
	যুঃ	১৬	১৬
অংসকূট	আঃ	১২—১৪	১৪—১৭
	যুঃ	১৩—১৬	১৪—১৯
প্রগণ্ডাস্থির উর্ধ্বপ্রান্ত	যুঃ	১৭—১৬	১৪—১৮
ডমরুক	আঃ	১০	১১
	যুঃ	৯—১৩	১১—১৫
বাহ্বার্বুদ	আঃ	১০	১২
	যুঃ	১০—১২	১১—১৬
প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্ত	যুঃ	১৪	১৬
বহিঃপ্রকোষ্ঠস্থির উর্ধ্ব প্রান্ত	যুঃ	১৪	১৬
অধঃপ্রান্ত	যুঃ	১৬½—১৮	১৬—১৭
কূর্পরকূট	আঃ	৯—১২	১১—১৩
	যুঃ	১৫	১৭
অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধোভাগ	আঃ	৮—১০	১০—১১
	যুঃ	১৭	১৮
শ্রোণিফলকের চূড়া	আঃ	১৪	১৭
	যুঃ	১৭—১৯	১৯—২০
উর্বস্থির উর্ধ্ব প্রান্ত	যুঃ	১৪—১৫	১৬—১৭
উর্বস্থির মহাশিখরক	যুঃ	১৪	১৭



অস্থিযুক্তির বয়ঃক্রম

অস্থির নাম[২৯] ও অংশ		কিশোরী বৎসর	কিশোর বৎসর
ঊর্বস্থির লঘুশিখরক	যুঃ	১৫—১৭	১৫—১৭
ঊর্বস্থির নিম্নপ্রান্ত	যুঃ	১৪—১৭	১৪—১৭
জঙ্ঘাস্থির ঊর্ধ্ব প্রান্ত	যুঃ	১৪—১৫	১৫—১৭
জঙ্ঘাস্থির নিম্নপ্রান্ত	যুঃ	১৪·১—১৪·৪	১৬
অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্ধ্বপ্রান্ত	যুঃ	১৪—১৬	১১—১৬
নিম্নপ্রান্ত	যুঃ	১৩—১৫	১৪—১৬
বর্তুলক	আঃ	৯—১২	১২—১৭
করাঙ্গুলিমূলশলাকা	যুঃ	১৪—১৫	১৬—১৮
করাঙ্গুলিনলক	যুঃ	১৪—১৬	১৬—১৮
পাদাঙ্গুলিনলক	যুঃ	১৩—১৫	১৫—১৮

আঃ=অস্থিরূপান্তর কেন্দ্রের আবির্ভাব। যুঃ=অস্থিযুক্তি।

যদিও দেহাস্থির গঠনবৈচিত্র্যের ক্রমপর্যায় থেকে বয়সের মোটামুটি ধারণা সম্ভব, তবুও বহু কারণে, বিশেষত দেহের পুষ্টি-বৃদ্ধির তারতম্যে, এই অস্থিগঠনেও তারতম্য ঘটতে পারে। ফলে হাড়ের ছবি দেখে বয়ঃক্রমের একটা আন্দাজ মাত্র সম্ভব। তাই বয়স নির্ধারণের সবকটি পন্থা একসংগে ধরে বিচার করাই শ্রেয়স্কর।

৫

বয়ঃসন্ধির বৃদ্ধিবিকাশ

বয়ঃসন্ধি হল সেই জৈব সন্ধিক্ষণ যখন ঘটে দেহের অন্তরংগ ও বহিরংগের পরিবর্তন, আর সাথে সাথে আসে বোধ ও কৃষ্টির পরিপুষ্টি। জীবনের এই দ্বিতীয় দশককে যদি এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ বলে ধরা যায়, তাহলে অন্যান্য দশকগুলিও কি সেই ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না? কেননা জীবনচক্র তো ক্রমাগতই আবর্তিত হচ্ছে এবং জীবনের প্রতিক্ষণই তাহলে সন্ধিক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু জীবনচক্রের আবর্তন তো সব দশকেই সমান তালে ঘটছে না। এক শিশুর জীবনে কয়েকটা বছরের যোগ যেমন ঢেউ তোলে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের জীবনে তেমন হয় না নিশ্চয়ই।

বয়ঃসন্ধি মানে শুধু মাত্র দেহমনের বৃদ্ধিই নয়, এই সন্ধিক্ষণে মিশে আছে puberty বা যৌনোদ্গমকাল, যখন জননশক্তির উদ্ভব হয়, যা জীবনের অন্যান্য দশকের সংগে তুলনায় আসে না। বয়ঃসন্ধিকালের ঠিক আগে অর্থাৎ প্রায় আট বছর পর্যন্ত বালক ও বালিকার বহিরংগের আকার-আয়তন প্রায় সমানই থাকে, যদিও আভ্যন্তরীণ সংগঠনে বিশেষ করে যৌনতন্ত্রের দিক থেকে জন্মকাল থেকেই বালক ও বালিকা বরাবরই আলাদা। বয়ঃসন্ধি-প্রবেশের সংগে সংগে কিন্তু লিংগভেদে বহিরংগ ও অন্তরংগ সংগঠন বিভিন্ন হতে শুরু করে।

বয়ঃসন্ধির সংগে সংগে বোধের বিকাশ মানবককে আত্মসচেতন, পরিপার্শ্ব-সচেতন ও ভবিষ্যৎ-সচেতন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। পরিবর্তিত দেহ এই মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে টেনে বার করে আনে।

বয়ঃসন্ধিকে কেবলমাত্র জৈবপ্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। এর মূল পরিচয় তার সংস্কারের মধ্যে। সামাজিক সুযোগ বা বাধা, শিক্ষার স্তর, শ্রমশিল্পের অবস্থা—এই সব জিনিষ যুবকৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পল্লীপরিবারের কিশোর যেমন তার পিতামাতার আদলে গড়ে ওঠে, নাগরিক পরিবারে তা ঘটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্কুল-কলেজের ছাত্র আর শিল্পশ্রমিক কিশোর একইভাবে গড়ে ওঠে না। নেপোলিয়ান যোল বছরে সেনাপতি হয়েছিলেন। তাই বলে এই ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে বর্তমানের এক যোল বছরের স্কুলছাত্রের চেয়ে তাঁর অন্যরকম কোন

জৈব পরিবর্তন ঘটেছিল। আসলে এই দুই ষোল বছরের কিশোর ভিন্ন সংস্কার-সম্পন্ন বিশ্বের বাসিন্দা। তেমনি আমাদের দেশেও দেখতে পাই ঠাকুমা যে বয়সে সন্তানবতী হয়ে পূরোপূরি সংসারী বনেছিলেন, সেই ঠাকুমার নাতনী সেই বয়সে আজকে স্কার্টফ্রক পরে নেচেকুঁদে বেড়িয়ে ফিরছে, যদিও জৈবিক পরিবর্তনের দিক থেকে ঠাকুমা নাতনীর তফাৎ প্রায় নেই-ই।

এতগুলো কথা বলার কারণ এই যে বয়ঃসন্ধির জৈব পরিবর্তন যদিও খুব জরুরী ব্যাপার, তবু শুধুমাত্র উক্ত পরিবর্তন এই কৈশোরের সব কিছু বুঝতে, সব কিছু ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়।

বহিরাকৃতির পরিবর্তন

প্রাক্-বয়ঃসন্ধিকালে দেহের বৃদ্ধি হয় মন্থরগতিতে, কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে হঠাৎই সবদিকের বাড় দ্রুততালে শুরু হয়ে যায়। সেই কারণে এই দ্রুতহারের বৃদ্ধিকে 'বৃদ্ধি-উৎক্ষেপ' (Growth spurt) বলা যেতে পারে।[৩০]

(১) **উচ্চতা-বৃদ্ধি বা হাড়ের বাড় ঃ** দেহের উচ্চতার দুই উপাদান—পায়ের দৈর্ঘ্য ও মূল কাণ্ডের দৈর্ঘ্য। দেহের বাড়ের প্রথম ভাগে পায়ের হাড়ের বৃদ্ধিহার বেশী থাকে, যার ফলে দেহাকৃতি লগবগে (gangling adolescent) রূপ নেয়। মূল দেহকাণ্ডের বাড় শুরু হয় প্রায় এক বছর পরে। কিন্তু আসলে মূল দেহকাণ্ডের অর্থাৎ মেরুদণ্ডের কশেরুকা অস্থিগুলির বৃদ্ধির ফলেই উচ্চতা-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিও হয় অসমভাবে। হাত-পায়ের হাড়ের নিম্নপ্রান্তের দিকের হাড়ের বৃদ্ধিহার প্রথমদিকে বেশী থাকে। ফলে, হাতের চেটো ও পায়ের পাতার এই অসমবৃদ্ধি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই হাতপায়ের অন্যান্য হাড়গুলির বৃদ্ধিহার এই বৈষম্য দূর করে বাড়ের সমতা এনে ফেলে।

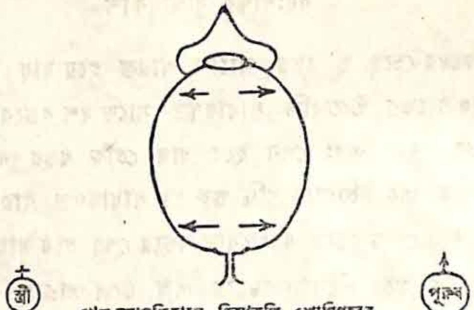
সর্বোচ্চগতির বৃদ্ধিকালে বালকের ক্ষেত্রে লম্বায় বাড়ার হার প্রতি বছর ৭ থেকে ১২ সেন্টিমিটার (গড়ে ৯.৫ সেঃ মিঃ) এবং বালিকার ক্ষেত্রে ৬ থেকে ১১ সেঃ মিঃ (গড়ে ৮.৪ সেঃ মিঃ)।[৩১] দশ বছর বয়স পর্যন্ত বালক ও বালিকার উচ্চতার বৃদ্ধিহার প্রায় সমানই থাকে। কিন্তু দশ বছরের পর চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বালিকার বৃদ্ধিহার বালকের বৃদ্ধিগতিকে হার মানায়, কেননা বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি-উৎক্ষেপ বালিকাদের ক্ষেত্রে প্রায় বার বছর বয়সে

অর্থাৎ বালকদের চেয়ে দু' বছর আগেই আরম্ভ হয়ে যায়।[৩২] বালিকাদের ক্ষেত্রে দেহের বাড়ের উচ্চগতি সাধারণত সাড়ে দশ বছরে শুরু হয়ে চরমে ওঠে বার বছর বয়সে এবং শেষ হয়ে যায় চৌদ্দ বছর বয়সে।[৩৩] আর, বালকদের ক্ষেত্রে এই উচ্চহারে বৃদ্ধি শুরু হয় সাধারণত বার থেকে তের বছর বয়সে, চরমে ওঠে চৌদ্দ বছরে এবং ষোল বছরে শেষ হয়ে যায়।[৩৪] তার ফলে, চৌদ্দ বছরের এক মেয়ে ও ষোল বছরের এক ছেলে তার পূর্ণবয়সের উচ্চতার প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ অর্জন করে ফেলে।

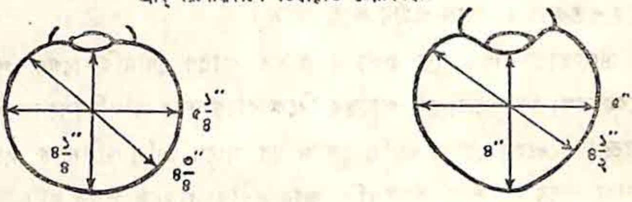
উচ্চতায় বাড়া বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ যৌনবিকাশের পরিপূর্ণতা। দেহের লম্বা হাড়গুলো দুই প্রান্তের দিকে বাড়ে তার এপিফিসিসের অস্থিরূপায়ণ কেন্দ্রে। দেহের যৌনরসগুলি মূল অস্থির সংগে এপিফিসিসকে সংযুক্তিকরণে সাহায্য করে। ফলে হাড়গুলি আর লম্বায় বাড়তে পারে না। কিশোরীর ক্ষেত্রে যৌনপরিপক্বতা আগে হয়ে যাওয়ার ফলে পূর্ণবয়স্ক এক পুরুষ পূর্ণবয়স্কা এক নারীর তুলনায় প্রায় শতকরা দশভাগ বেশী লম্বা হয়ে থাকে, কেননা দেরীতে যৌনপক্বতা আসার দরুণ কিশোর লম্বায় বাড়তে সময় পায়।

উচ্চতা-বৃদ্ধির জন্য প্রত্যংগ ও কশেরুকা হাড়ের বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য হাড়ের বৃদ্ধিও ঘটে। করোটির হাড়গুলিরও বৃদ্ধি-বিকাশ হতে থাকে। শৈশব থেকে করোটির ব্যাস এতদিন ছিল অপরিবর্তিত। এই বয়ঃসন্ধিকালে তার কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে।

বিশেষ করে শ্রোণিচক্রের অস্থিগুলির বৃদ্ধি এই বয়ঃক্রমে তাৎপর্যপূর্ণ। বয়ঃসন্ধিকালে শ্রোণিচক্রের বিস্তার বাড়ে। সাত থেকে এগার বছরের কিশোরীর শ্রোণি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়ে নারীসুলভ আকার-আয়তন গ্রহণ করে। বয়ঃসন্ধির প্রাক্কালে উভয় লিংগেই শ্রোণিচক্রের আকার থাকে ডিম্বাকৃতি—পাশাপাশির ব্যাস সামনে-পেছনের ব্যাসের থেকে থাকে ছোট। বয়ঃসন্ধির আগমনে কিশোরদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পিছনদিকে পাশাপাশি ব্যাসের বৃদ্ধি ঘটে, ফলত শ্রোণিচক্রের আকার দাড়ায় হরতনের মত। আর কিশোরীদের ক্ষেত্রে পাশাপাশির ব্যাস সামনে-পেছনে দুদিকেই বেড়ে প্রায় গোলাকৃতি শ্রোণিচক্রের সৃষ্টি করে। তাছাড়া স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দুদিকের ভগাস্থির (pubis) মধ্যে সৃষ্ট কোণ প্রশস্ততর হয়। ত্রিকাস্থি (sacrum) পুরুষের ক্ষেত্রে নীচের দিকে হঠাৎ সামনে বাঁক নেয়, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তেমন হয় না। উপরন্তু ত্রিকাস্থি থেকে ভগাস্থির দূরত্ব অর্থাৎ শ্রোণিচক্রের সামনে-পেছনের ব্যাসও স্ত্রীলোকের

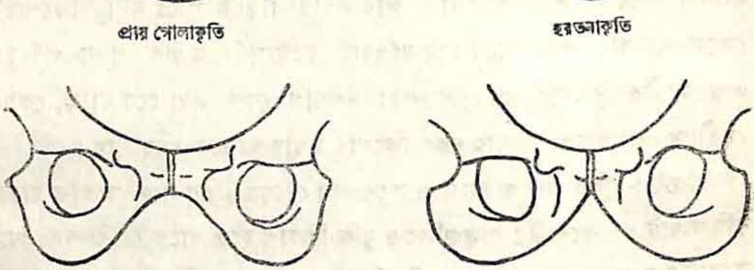


প্রাক্‌-বয়ঃসন্ধিকালে ডিম্বাকৃতি শ্রোণিগহ্বর

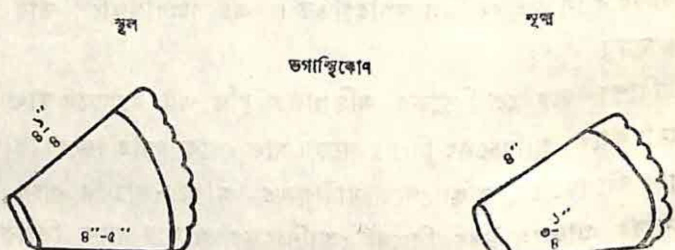


প্রায় গোলাকৃতি

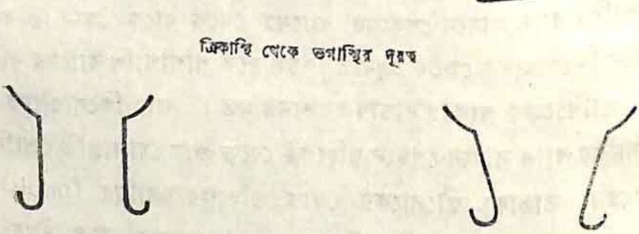
হৃদাকৃতি



ভগাস্থিকোণ



ত্রিকাস্থি থেকে ভগাস্থির দূরত্ব



শ্রোণিগহ্বরের পার্শ্বপ্রাচীর

বয়ঃসন্ধিকালে লিংগভেদে শ্রোণির বিকাশ-বিভেদ

ক্ষেত্রে বেশী থাকে। এ'ছাড়া, শ্রোণিগহ্বরের পার্শ্বপ্রাচীর কিশোরীর ক্ষেত্রে থাকে খাড়াই, আর কিশোরের ক্ষেত্রে হয় ক্রমশ ঢালু—ফলে শ্রোণিগহ্বরের প্রবেশপথ আর প্রস্থানপথ প্রায় একই মাপের হয় স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে।[৩৫] শ্রোণির এই বৃদ্ধি-বিবর্তনের মূল লক্ষ্য হ'ল কিশোরীর ভবিষ্যৎ সন্তানধারণের যোগ্যতা তৈরী করা। বয়ঃসন্ধিকালে শ্রোণিদেশের এই বিশেষ পরিধি-বিস্তারের ফলেই কিশোরী হয়ে ওঠে গজেন্দ্রগমিনী বা মরালগতিসম্পন্না।

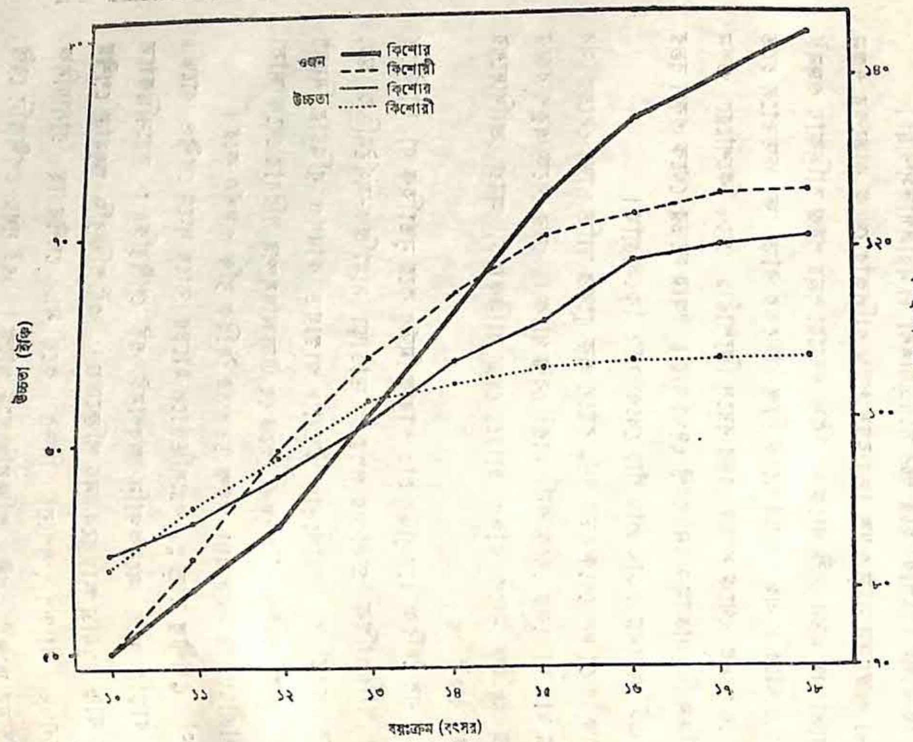
(২) **ওজনের বাড়ঃ** দশ বছর বয়স পর্যন্ত বালিকার থেকে বালকের ওজন দু' কিলোগ্রাম মতন বেশী থাকে। কিন্তু এগারো বছর পর্যন্ত বালিকার ওজনই বেশী হয়ে থাকে। এই বয়সের পরেই কিন্তু বালকের বাড় এত দ্রুততালে হতে থাকে যে পনের থেকে সতের বছর বয়সে কিশোরীর :থেকে কিশোরের ওজন প্রায় তিন কিলোগ্রাম মতন বেশী দেখা যায়। আর সতের থেকে একুশ বছর পর্যন্ত এই ওজনের তফাৎ প্রায় পাঁচ থেকে সাত কিলোগ্রাম।

লক্ষণীয় যে দশ থেকে তের বছর বয়সে এক বুকের ছাতি ছাড়া দেহের সব দিকের মাপ বালকের থেকে বালিকারই বেশী থাকে। তের থেকে একুশ বছরে আবার দৈহিক মাপে বালক হারিয়ে দেয় বালিকাকে, অবশ্য শ্রোণিদেশের আয়তন বাদ দিয়ে।

এই সব দৈহিক বাড়বৃদ্ধির হার আবার নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত অথবা পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ওপর। তাছাড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর, পুষ্টিগত অবস্থা বা রোগভোগ ইত্যাদি স্বাস্থ্যগত কারণও বৃদ্ধিহার নিয়ন্ত্রণ করে। এক সমীক্ষায়[৩৬] দেখা গেছে যে উচ্চআয়সম্পন্ন পরিবার থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা বার বছর বয়স পর্যন্ত উন্নততর দৈহিক বৃদ্ধি প্রদর্শন করে।

(৩) **পেশীর বাড়ঃ** বয়ঃসন্ধিকালে হাড়ের সংগে সংগে পেশীও বাড়ে। ওজন বাড়ার মূলে অনেকখানি অবদানই এই পেশীবৃদ্ধির। বয়ঃসন্ধিকালে পেশীর বাড় শুধুমাত্র আয়তনে নয় শক্তিতেও। এই শক্তিবৃদ্ধি শুধুমাত্র পেশীর আয়তনগত বাড়ের ওপরেই নির্ভর করে না, পেশীমধ্যস্থ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেই পেশীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে থাকে। এই সময় পেশীগুলি বেশী পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ পায়ও বটে, আর ব্যবহারও করে বেশী।

বয়ঃসন্ধির পূর্বে বালক-বালিকার মধ্যে পেশীর গঠনগত বা শক্তিগত পার্থক্য তেমন থাকে না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকাল থেকে পেশীর বাড়ের লিংগ-গত পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে এবং বিভিন্ন শক্তি-পরীক্ষায়ও তা ধরা পড়ে।[৩৭] পেশীর



বয়ঃসন্ধির বয়ঃক্রমে উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধিক্রম

(H. L, Barnett ও A, M, Einhorn সম্পাদিত PEDIATRICS (১৫শ সংস্করণ, ১৯৭২) গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যনির্ভর লেখচিত্র)

বাড় প্রধানতঃ পেশীকোষের আয়তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাবৃদ্ধি হয় চৌদ্দ-গুণ, অথচ কিশোরীর ক্ষেত্রে হয় দশগুণ।[৩৮] ছেলেদের ক্ষেত্রে শরীর চালনায় গতি ও সংগতি অনেক বেশী, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে অংগুলিচালনায় নৈপুণ্য থাকে বেশী।[৩৯] চৌদ্দ থেকে আঠার বছর বয়সে অংগচালনার ক্ষিপ্রতা ছেলেদের থাকে বেশী। তবে পেশীচালনায় ক্ষিপ্রতা ও তীব্রতা সম্পর্কিত লিংগগত ভেদ কতটা সাংস্কারিক আর কতটা শারীরিক তা বিচারসাপেক্ষ। কেননা বয়সকালীন দৈহিক উচ্ছ্বাস মেয়েদেরও কম দেখা যায় না।

(৪) **মেদবৃদ্ধি ঃ** দেহের প্রস্থের প্রসার কিশোরদের ক্ষেত্রে প্রধানত হাড়-মাসের বাড়ের ফলে হলেও কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই প্রস্থবৃদ্ধি প্রধানত মেদবৃদ্ধির কারণেই ঘটে। শৈশবের অন্তিমকাল থেকেই দেহের এই চর্বি-সংস্থান শুরু হলেও কিশোরীদের ক্ষেত্রে ষোল-সতের বছর বয়স পর্যন্ত এই মেদবৃদ্ধি ঘটে যেতে থাকে। ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় এর উল্টোটা—দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির সংগে সংগে তাদের দেহের চর্বি, বিশেষ করে অধিত্বকীয় চর্বি, কমতে থাকে, ফলে এক কৃশতর কিশোর (string bean) প্রতিভাত হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালে চামড়ার নীচে চর্বি জমতে শুরু করে—বিশেষ করে শ্রোণিদেশে, স্তনে এবং প্রগণ্ডের পশ্চাৎদেশে। ফলত কিশোরীর দেহ সাধারণত গোলগাল কমনীয় হয়ে ওঠে।[৪০]

আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের গঠনবৃদ্ধি

বয়ঃসন্ধিকালে বহিরংগের বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের সংগে সংগেই দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলিও সর্বাংশে বাড়তে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম অবশ্য লসিকাতন্ত্রের—যেখানে বয়স বাড়ার সংগে সংগে আকৃতির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটতে দেখা যায়। এই সময়ে যৌনগ্রন্থি ও জননযন্ত্রসমুদয়ের বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা ঘটতে থাকে, স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায় এবং দেহের অন্যান্য তন্ত্রগুলিও ক্রমশ বৃদ্ধি-বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার পথে এগোতে থাকে।

(১) **রক্ত ও রক্তসংবহনতন্ত্রের বৃদ্ধি-বিকাশ ঃ** হৃৎপিণ্ড পেশীনির্মিত যন্ত্র। তাই এই বয়ঃসন্ধির বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের কালে দেহের অন্যান্য পেশীবৃদ্ধির সংগেই হৃৎপেশীরও বৃদ্ধি ঘটে সমতালে। হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় দ্বিগুণ হয়। হৃৎপিণ্ডের আকার-আয়তনের এই বাড় অবশ্য বালকদের ক্ষেত্রে হয়

থাকে। ফলে মস্তিষ্কের ওজন বৃদ্ধি না ঘটেও জটিল সংযোগী জালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের প্রসার ঘটা সম্ভব হয়।[৪৭]

(৫) **লসিকাতন্ত্র :** যদিও বয়ঃসন্ধিকালে দেহের সবকটি যন্ত্রেরই আকার-আয়তনে বৃদ্ধি ঘটে থাকে, দেহের অন্ততঃ একটি তন্ত্রের কিন্তু এই বয়সে হ্রাস ঘটে। এই তন্ত্রটি হ'ল লসিকাতন্ত্র। যার মধ্যে থাইমাস গ্রন্থি, টনসিল, এডিনয়েড প্রভৃতি লসিকাগ্রন্থি রয়েছে। শৈশবে এইগুলি আকারে বড় থাকে এবং বহু সংক্রামক আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। বয়ঃসন্ধিকালে এই লসিকাতন্ত্রের অবনমন স্বভাবতই কৈশোরসুলভ কতকগুলি রোগসংক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৬

বয়ঃসন্ধির যৌন-বিকাশ

বয়ঃসন্ধির অনেকখানিই যেহেতু puberty বা যৌনোদ্গম প্রক্রিয়ার সংগে জড়িয়ে আছে, জননতন্ত্রের বৃদ্ধিবিকাশ তাই এই বয়সের এক বিশেষ ঘটনা। এই বয়ঃসন্ধিকালেই একটি শিশুর বালক বা বালিকা হিসাবে অস্তিত্ব ঘোষিত হয় তার দৈহিক, বাচিক ও মানসিক আচরণে—এক কিশোর তাই এক কিশোরীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই বয়ঃসন্ধিকালে বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগীর অপেক্ষা রাখে।

জন্মকাল থেকে বা আরো আগে থেকেই শিশুর লিংগ নির্ধারিত—যৌন-গ্রন্থির ও যৌনযন্ত্রের বিভিন্নতা তাকে ছেলে-শিশু ও মেয়ে-শিশু হিসাবে চিহ্নিত করে রাখে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে সে আয়ত্ত করতে থাকে জননক্ষমতা। তাই সেই প্রয়োজনে মুখ্যত তার যৌন ও জনন যন্ত্রগুলির বৃদ্ধিবিকাশ ঘটে এবং সেই সংগে গৌণত জন্মায় কিছু বহিরংগের অযৌন পরিবর্তন এবং সবটা মিলিয়েই বয়ঃসন্ধি-প্রকরণ।

যৌনগ্রন্থি ও জননতন্ত্রের বৃদ্ধিবিকাশ

বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি-উৎক্ষেপে দেহের অন্যান্য অংশের মত জননতন্ত্রেরও সমতালে বৃদ্ধি ঘটে থাকে। তবে, হাড়মাস বা অন্যান্য তন্ত্রের বৃদ্ধি শুধুমাত্র পরিমাণগত বা মাত্রাগত; আর জননতন্ত্রের বৃদ্ধিবিকাশ সেইসংগে হয় গুণগতও। ফলে, অন্যান্য দেহগত পরিবর্তনের চেয়ে জননতন্ত্রের পরিবর্তনস্থলে স্ত্রীপুরুষ ভেদ প্রকটতর। সেই কারণে যৌন ও জননতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষ ভেদে পৃথক বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

অন্যান্য শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন, জননতন্ত্রের বিকাশ-বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তেমনই, বয়সের হেরফের হ'তে পারে জাতিগত বৈশিষ্ট্য, স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও আহার-পুষ্টির তফাতের ওপরে। তবে সাধারণভাবে জননতন্ত্রের বিকাশকালকে বয়সানুসারে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে[৩৩,৩৪]—

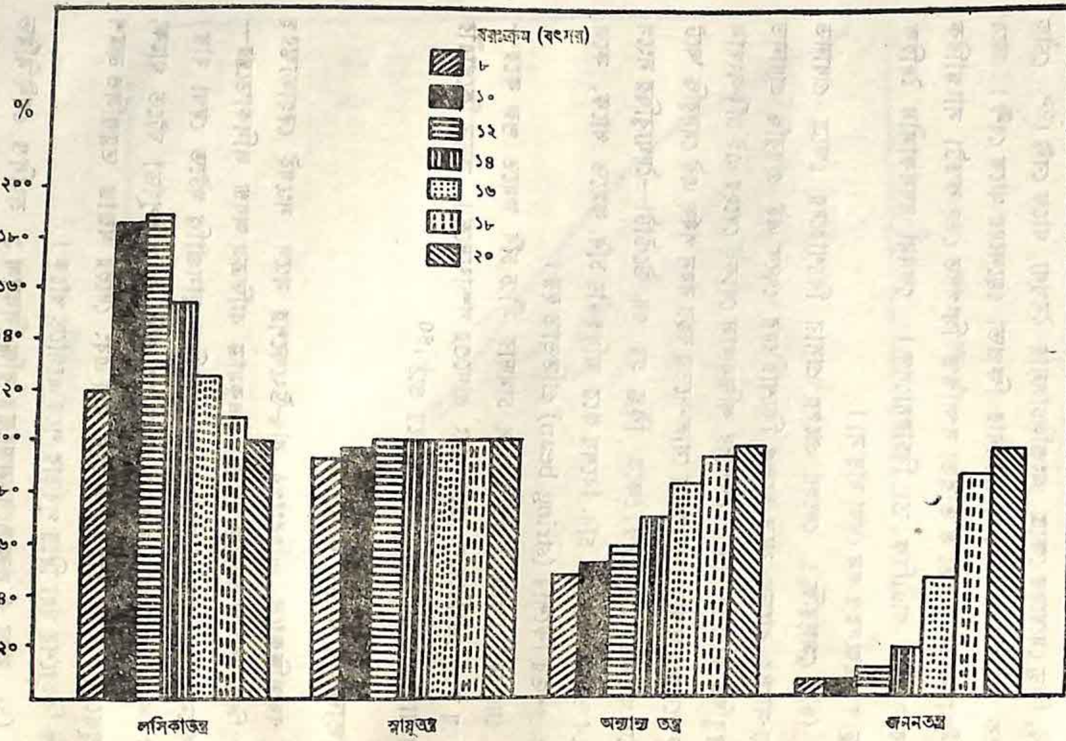
১। ৭ থেকে ১০ বছর—প্রাক্-বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থা ;

২। ১০ থেকে ১১ বছর—প্রাথমিক যৌন পরিবর্তনের শুরু ;

৩। ১১ থেকে ১২½ বছর—উক্ত অবস্থার অগ্রগতি ;

৪। ১২½ থেকে ১৪ বছর—ক্রমশ বিকাশ ; এবং

৫। ১৫ থেকে ১৯ বছর—প্রাপ্তবয়স্কদের সমান আকার-আয়তন প্রাপ্তি।



বয়ঃসন্ধির বয়ঃক্রমে দেহতন্ত্রসমুচয়ের বিকাশক্রম (R. E. Scammon[৪১] বর্ণিত বিবরণভিত্তিক লেখচিত্র)

প্রকটতর।[৪২] হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের হার শৈশবে থাকে প্রায় মিনিটে ১২৫—এই হৃৎ-তাল (heart rate) বয়স বাড়ার সংগে সংগে ক্রমাগত কমতে কমতে কৈশোরে এসে দাঁড়ায় মিনিটপ্রতি প্রায় ৮০-তে।[৪৩] রক্তচাপও শৈশবের স্তর থেকে বাড়তে বাড়তে এই বয়সে এসে প্রায় বয়স্কমানে পৌছয়। এই বৃদ্ধির হারও দেখা যায় পুরুষের ক্ষেত্রে বেশী।[৪৪]

বয়ঃসন্ধিক্ষণে রক্তের মোট পরিমাণ, কণিকা সংখ্যা ও হিমোগ্লোবিনের মানেরও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন বালিকাদের চেয়ে বালকদের ক্ষেত্রেই বেশী প্রকট। পরিণত অবস্থায় রক্তকণিকার সংখ্যা মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতি মিলিলিটার রক্তে প্রায় দশলক্ষ কম থাকে ছেলেদের চেয়ে।[৪৪]

(২) **শ্বসনতন্ত্র ঃ** এই সময় ফুসফুস আর তার নালীগুলির আকার বৃদ্ধি এবং সংগে সংগে ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে থাকে।[৪৫] শ্বসন-হার শৈশবের থেকে বয়ঃসন্ধিকালে কমে যায় বটে, কিন্তু প্রতি প্রশ্বাসে গৃহীত হাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়, বিশেষ করে উচ্চশ্রমক্ষম কিশোরদের ক্ষেত্রে।

(৩) **আন্তরযন্ত্র ঃ** যকৃত, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয়, প্লীহার লসিকাবিহীন অংশ প্রভৃতি উদরমধ্যস্থ যন্ত্রগুলি বয়ঃসন্ধির বৃদ্ধি-উৎক্ষেপে অংশগ্রহণ করে। এগুলির আকার-আয়তনের যথেষ্ট বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।[৪৬]

(৪) **মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র ঃ** বয়ঃসন্ধিকালে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি-বিকাশ এক রহস্যবিশেষ। বয়ঃসন্ধিকালে চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের পদচিহ্ন লক্ষিত হলেও মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ কোনো গঠনগত পরিবর্তন দেখা যায় না। জন্ম-সময়েই মস্তিষ্ক তার পরিণত ওজনের সিকিভাগ পেয়ে যায়। তারপর বাড়তে বাড়তে পাঁচ বছর বয়সে ৯০ শতাংশ এবং দশ বছরে প্রায় ৯৫ শতাংশ ওজন আয়ত্ত করে। সুতরাং বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি-উৎক্ষেপে মস্তিষ্কের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা সন্দেহাতীত নয়। তবে মস্তিষ্কের বিদ্যুল্লেখতে (electroencephalo-gram) দেখা যায় শৈশবের নিম্নকম্পাংকের লেখতরংগ এই বয়ঃসন্ধিতে এসে আলফা-তরংগে রূপান্তর গ্রহণ করে।

জন্মের আগেই যেহেতু স্নায়ুতন্ত্রের কোষগুলি পূর্ণ বিকশিত হয়ে যায়, তখন বয়ঃসন্ধির বিকাশকালে এই কোষগুলির পারস্পরিক সংযোগ নিশ্চয়ই বর্ধিত হয়ে বোধশক্তির বর্ধন ঘটিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে স্নায়ু-কোষগুলির সংযোগী উদ্গত অংশ কৈশতন্তুর (dendrite) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে

কিশোরদের যৌনবিকাশঃ পুংজননগ্রন্থি শুক্রাশয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ বয়ঃসন্ধিকালে সম্পন্ন হয়ে যায়। শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি দিয়েই যৌনবিকাশের আরম্ভ সূচিত হয়। সাধারণত ১০ থেকে ১৩½ বছরে এই বৃদ্ধি সুরু হয় এবং পূর্ণবিকাশ ১৪½ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়। শুক্রাশয়ের এই বিকাশ বেশ ধীর গতিতে হয়, তাই কিশোরীর বক্ষবৃদ্ধির মত ততটা প্রকট হয় না।

শুক্রাশয় বা অণ্ডকোষ হ'ল পুংজননগ্রন্থি, যার থেকে শুক্রকীট ও পুংযৌনরস ক্ষরিত হয়ে থাকে। শুক্রকীট জন্মায় শুক্রনালীর (seminiferous tubules) মধ্যে। বয়ঃসন্ধিকালে এই নালীগুলি আকারে বাড়ে, পেঁচালো আকার ধারণ করে এবং নালীমধ্যস্থ কোষস্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণায়ত শুক্রকীট প্রস্তুত হয়। সেই সংগে লেডিগ কোষগুলি (Leydig cells) পুংযৌনরস (androgen) নিঃসরণ শুরু করে। ফলত, ১০ থেকে ১১ বছর বয়সে মুস্কথলি (scrotum) ও অণ্ডকোষের সামান্য আকারবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু এই বয়সে শিশ্নের (penis) কোনরকম বৃদ্ধি ঘটে না। পুরুষ-জননাংগ শিশ্ন সাধারণত ১১ বছরের পর থেকে প্রধানত দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকে এবং ১৪-১৫ বছরে দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুদিকেই বাড়ে। ইতিমধ্যে মুস্কথলি ও তন্মধ্যস্থ অণ্ডকোষের বৃদ্ধি বিকাশ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে শুক্রাশয়মধ্যস্থ নালীগুলি বাড়ার সংগে সংগে সহযোগী গ্রন্থি প্রোষ্টেট (prostate) ও আয়তনে বাড়ে ও তার ক্ষরণ শুরু হয়ে যায়।

শুক্রাশয়জাত শুক্রকীট ও প্রোষ্টেট থেকে ক্ষরিত রস সমন্বয়ে প্রস্তুত হয় শুক্র, রেতঃ বা বীর্য (semen) এবং এই শুক্রক্ষরণই হ'ল পুরুষের ক্ষেত্রে যৌন-পরিতৃপ্তির (orgasm) লক্ষণ। পুরুষের যৌনবিকাশের পরিপূর্ণতার চাবিকাঠি হ'ল এই শুক্রনিক্ষেপণ ক্ষমতা, কেন না পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা এই রেতঃস্খলনের ওপর নির্ভরশীল। উপরন্তু মানসিক দিক থেকেও এর উপযোগিতা এই যে রেতঃস্খলনজনিত যৌনপরিতৃপ্তি পৌরুষদ্যোতক।

প্রথম রেতঃস্খলন কিশোরের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কিশোরীর রজোপ্রবৃত্তির মতই উত্তেজনাময়। কোন বয়সে এটা ঘটবে তার অবশ্য অনেক হেরফের হতে পারে।

এক সমীক্ষায়[৪৮] প্রকাশ যে কমপক্ষে ৮ বছর বয়সে এবং বেশীর দিকে ২১ বছরে প্রথম রেতঃস্খলন ঘটার কথা জানা গেছে। শতকরা নব্বইজন কিশোরের এই অভিজ্ঞতা ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সে জন্মায়। এ ব্যাপারে অবশ্য সামাজিক-অর্থ নৈতিক-সাংস্কৃতিক স্তরের তারতম্যের প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। উক্ত

সমীক্ষার বিবরণে[48] আরো জানা যায় যে শুক্রনিক্ষেপণের প্রথম অভিজ্ঞতা তিনজনের মধ্যে দুজনের ঘটে স্বমৈথুন প্রক্রিয়ায়, আটজনের মধ্যে একজনের ঘটে নৈশস্খলনের মাধ্যমে এবং কুড়ির মধ্যে একজনের ঘটে সমমৈথুন দিয়ে। শুক্রনিক্ষেপণ সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস যে এটা প্রধানত নৈশস্খলন দিয়েই শুরু হয়। এই সমীক্ষায় বোঝা গেল যে সে ধারণা অভ্রান্ত নয়। শুধু পাশ্চাত্য দেশেই যে এমনটা হয়ে থাকে, তাও নয়। প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যিকের জবানীতেই তাহলে শুনুন—"নিজের দেহ থেকে নিজের সামান্য চেষ্টায় কি করে রতিসুখ লাভ করা যায় তা আমাকে কেউ শেখায়নি, আমি নিজেই আবিষ্কার করেছিলাম। মা একদিন আমার বিছানার চাদরে কতকগুলি দাগ দেখে দারুণ গম্ভীর হয়ে গেল। স্কুল থেকে ফিরে এলে খাবার সারবার পর মা আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলল, অনেক বোঝালো। আমি চুপ করে শুনে গেলাম। মা আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা চাইল, আমি মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা দিলাম। কদিন পরে মা আবার আমার বিছানায় দাগ দেখতে পেল। আবার আমাকে অনেক কিছু বলল। আমি আবার মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। বিছানায় আবার দাগ লাগল।"[6] তার মানে এমন ঘটনা বিশ্বজনীন।

কিশোরীদের যৌনবিকাশ: যদিও কিশোরীর যৌনবিকাশের প্রধান লক্ষণ রজোপ্রবৃত্তি (menarche), এই প্রথম ঋতুস্রাবের বহু আগে থেকেই কিন্তু বালিকাদের জননতন্ত্রের পরিণতি-প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ডিম্বাশয় (ovary), জরায়ু (uterus) ও জরায়ুনালী (fallopian tube) আকারে বাড়তে থাকে এবং ওজনে ভারী হয়ে শ্রোণিপ্রকোষ্ঠে স্থান গ্রহণ করে। শ্রোণিচক্রের হাড়গুলিও ৯-১০ বছর বয়স থেকে বিশেষভাবে প্রসারিত আয়তন গ্রহণ করে যাতে ঐ সব স্ত্রীজননতন্ত্রের যন্ত্রগুলি ধারণ করতে সক্ষম হয়।

স্ত্রীযৌনগ্রন্থি ডিম্বাশয় থেকে প্রজননোপযোগী ডিম্বস্ফোটন হয়, আর ক্ষরিত হয় দুটি অন্তঃরস—এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরোন। বিকাশকালে ডিম্বাশয় বয়স বাড়ার সংগে তাল রেখে ওজনে ও আয়তনে বাড়ে। জন্মসময়ে যে ডিম্বাশয়ের ওজন ছিল ০·৩ গ্রাম ও আয়তন ছিল ১·৫ সে. মি. × ০·২৫ সে. মি, বয়ঃসন্ধিকালে তার ওজন দাঁড়ায় ৩-৪ গ্রাম ও আয়তন ৩·৫ সে. মি. × ২ সে. মি.।

স্ত্রীজননতন্ত্রের অন্যতম প্রধান যন্ত্র জরায়ু ভ্রূণ-ধারণের জন্য নির্দিষ্ট। বয়ঃসন্ধিকালে এই যন্ত্রের পেশী-প্রাচীর আকারে ও আয়তনে বাড়ে ও জরায়ু-

অন্তর্কলায় (endometrium) পরিবর্তনের চক্র শুরু হয়ে যায়। প্রাক্-কৈশোরকালের তুলনায় এই সময়ে জরায়ু লম্বায় প্রায় দ্বিগুণ এবং ওজনে প্রায় দশগুণ বেড়ে যায়। যোনীনালীও (vagina) দৈর্ঘ্যে বাড়ে—জন্ম সময়ে যা ছিল ৪ সে. মি., এই সময়ে তা দাঁড়ায় ১২ সেন্টিমিটারে। যোনীনালীর আস্তরাবরণীকলার কোষগত পরিবর্তন আসলে আসন্ন যৌনপরিপূর্ণতার আভাস দেয় এবং তা অন্যান্য যৌনলক্ষণের আগেই আবির্ভূত হয়।[৪৯] যোনী-নালীতে ক্ষরণেরও চরিত্রপরিবর্তন হয়—প্রাক্-কৈশোরে যা ছিল ক্ষারতা-সমন্বিত, বয়ঃসন্ধিকালে তা হয় অম্লতামণ্ডিত।

বহির্যোনী (vulva) বা যোনীমুখ হল স্ত্রীলিংগের বাইরের পরিচয়। শ্রোনিদেশের সম্মুখভাগে ভগাস্থির উপরস্থ অধিত্বকে চর্বি জ'মে এই বয়সে এক উঁচু অঞ্চল সৃষ্টি করে, যাকে চলতি কথায় বলে রতিচূড়া বা Mount of Venus। বয়ঃসন্ধিজনিত পরিবর্তন পরিপূর্ণ হলে যোনীমুখের বহিরোষ্ঠও (labia majora) চর্বিসমৃদ্ধ হয়ে যোনীনালীমুখ আবৃত করে রাখে। কুমারী কিশোরীদের অনেকের ক্ষেত্রে যোনীনালীমুখ সতীচ্ছদ (hymen) দ্বারা আবৃত থাকে।

স্ত্রীজননতন্ত্রের কার্যকলাপের প্রধান লক্ষণ হল চক্রাকারে ঋতু বা রজঃস্রাব। প্রথম ঋতুস্রাব প্রায় বহুক্ষেত্রেই শরীরমনের সংস্কারজাতক, কেননা এই প্রথম ঘটনা দিয়েই প্রত্যক্ষত কিশোরীর নারীত্বে প্রবেশ ঘটে। বহু সমাজে তাই রজোপ্রবৃত্তির ঘটনা উপলক্ষে অনেক সামাজিক রীত-প্রকরণ চালু আছে।[৫০] অবশ্য, সাধারণ সভ্যসমাজে এ ঘটনা শুধুমাত্র পারিবারিক গণ্ডীতেই জানাজানি হয়ে থাকে। যে কিশোরী এ ঘটনার ব্যাপারটা আগে থেকে না জানে যোনী-মুখ থেকে হঠাৎ রক্তক্ষরণের ঘটনা তাকে সবিশেষ বিচলিত ও আতংকিত করে তুলতে পারে। তবে সম্ভবত সকল পরিবারেই আজকাল কিশোরীদের এ বিষয়ে অবহিত করা হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবিধানগুলিও শেখানো হয়ে থাকে।

একটা ভুল ধারণা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে যে ঋতুস্রাবের শুরুই বয়ঃসন্ধির দিগদর্শক। আসলে কিন্তু প্রথম মাসিক স্রাব বয়ঃসন্ধির বয়ঃ-ক্রমের মধ্যভাগে ঘটে থাকে। সাধারণতঃ স্তনবিকাশের শুরুর দু' বছর পরে মাসিক শুরু হয়, এবং এই রজোপ্রবৃত্তির কালে শতকরা ৩০ ভাগ কিশোরীর স্তনবিকাশ তৃতীয় স্তরে এবং শতকরা ৬০ ভাগ কিশোরীর চতুর্থ স্তরে পৌছে

যায়।[৩৩] অন্য একমতে[৫১] ঋতুদ্গমকালে ৪০ শতাংশের তৃতীয় স্তরে ও ৩২.৫ শতাংশের চতুর্থ স্তরে স্তনবিকাশ ঘটে থাকে।

মাসিক শুরুর বয়স সুশ্রুতসংহিতা মতে ১২ বৎসর—

"রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ততে।
তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্ধ্বং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥"[১৬]

রজোপ্রবৃত্তির এই বয়স সম্পর্কে প্রায় ১৩০ বছরের পর্যবেক্ষণে ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রথম ঋতু আবির্ভাবের হিসাব মেলে এইরকম—

১৮৪৫ খ্রীঃ	বোম্বাই	১৩.৬ বছর[৫২]
১৮৪৮ খ্রীঃ	বঙ্গদেশ	১২.৩৮ বছর[৫৩]
১৯২০ খ্রীঃ	বঙ্গদেশ	১৩.৬৪ বছর[৫৪]
১৯৫৪ খ্রীঃ	আসাম	১৩.৩৯ বছর[৫৫]
১৯৫৭ খ্রীঃ	অন্ধ্র	১৩.৫৩ বছর[৫৬]
১৯৬১ খ্রীঃ	পশ্চিমবঙ্গ	১৩.৬ বছর[৫৭]
১৯৭৫ খ্রীঃ	পশ্চিমবঙ্গ	১২.৪৮ বছর[৫৮]
১৯৭৬ খ্রীঃ	রাজস্থান	১৪.৬৫ বছর[৫৯]

তবে উপরের হিসাব হ'ল গড় হিসাব। পৃথিবীর যে কোন স্থানেই রজোপ্রবৃত্তির বয়স ৯ থেকে ১৮ বছরের যে কোন সময়েই হতে দেখা যায়।

আর এক বিস্ময়কর তথ্য হলো এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ঋতুদ্গমের বয়স ক্রমশ নীচের দিকে নামতে দেখা যাচ্ছে। বহুদেশের হিসাব ধর্তব্যের মধ্যে এনে ১৮৩০ থেকে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি দশকে এই বয়স নামছে প্রায় চার মাস হারে।[৬০] খাদ্য-পরিপুষ্টির উন্নতি এই বয়স নামার অন্যতম সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। কেননা, যে সব কিশোরীর তাড়াতাড়ি মাসিক সুরু হয়, তারা সাধারণতঃ উন্নত আর্থিক অবস্থার স্তরে অবস্থান করে এবং সুপরিপুষ্ট শরীরের অধিকারিণী হয়ে থাকে।

যে বয়সেই শুরু হোক, প্রথম রজঃস্রাবের পরেও প্রায় দু' থেকে ছ'মাস বা তার চেয়ে বেশী সময়ের জন্য ঋতুবন্ধ বা অনিয়মিত ঋতু হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তার ফলে, কিশোরী বা তার অভিভাবিকারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'তে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তা হওয়া সম্ভব। পিটুইটারী থেকে ডিম্বাশয় এবং তার থেকে জরায়ু—এই অক্ষপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়মিত হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগেই, আর তাই মাসিকস্রাবের নিয়মিততা আসতে দু' থেকে তিন বছর সময় লাগা বিচিত্র নয়।

৭

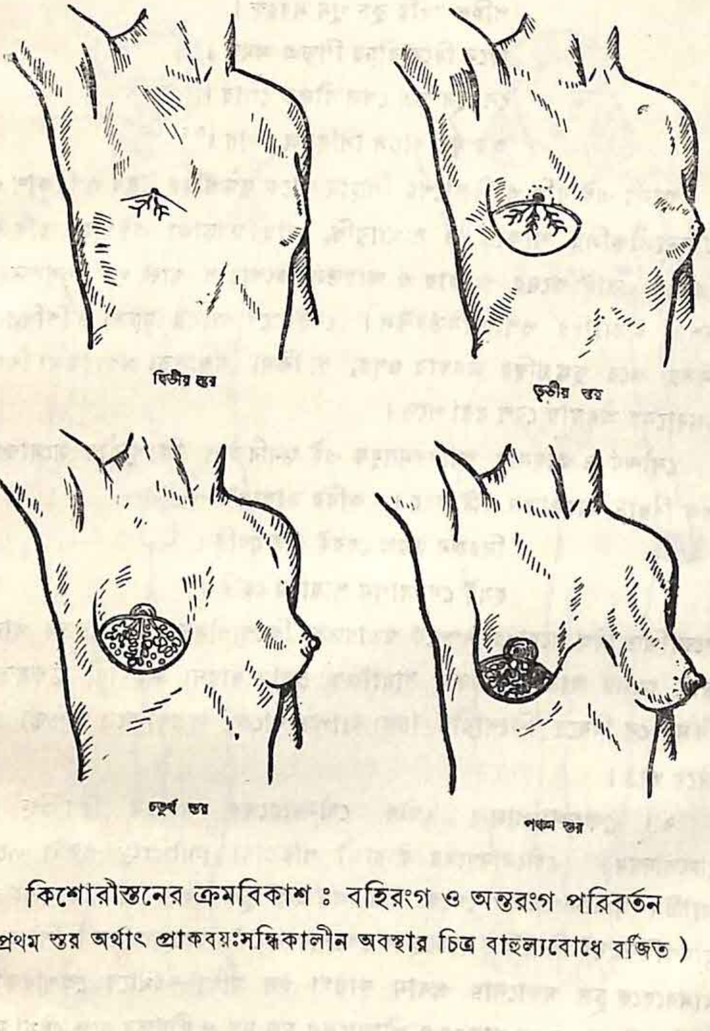
বয়ঃসন্ধিকালে গৌণযৌনচরিত্রের বিকাশ

স্ত্রীপুরুষের লিংগভেদের মৌল কারণ হ'ল যৌনগ্রন্থির বিভিন্নতা। জন্ম থেকেই লিংগভেদে জননাংগ পৃথক-পৃথক হয়েই থাকে—শুধু বয়ঃসন্ধিকালে ওগুলির পরিণতি ঘটে মাত্র। এবং এই সময়েই গৌণ বা আনুষংগিক যৌন চরিত্রের (Secondary sexual characters) উদ্ভব হয়। আর এইসব গৌণ বৈশিষ্ট্যগুলিই কিশোর-কিশোরীর বহিরংগের লিংগ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষভেদ সূচিত করে।

এই সব আনুষংগিক যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু আসলে অযৌন বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এগুলির পিছনে থাকে বিশেষ যৌনগ্রন্থির ক্ষরিত রসের প্রভাব। কিশোরীর স্তন-আবির্ভাব বা পুরুষের স্বর-পরিবর্তন, দাড়ি-গোঁফ গজানো ইত্যাদি এই সব গৌণ যৌন-বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

১। **স্তনবিকাশ ঃ** কিশোরীর যৌনবিকাশের প্রথম প্রতীয়মান চিহ্ন হ'ল স্তনের বৃদ্ধি ও বিকাশ। তিন বছর বয়সেই স্ত্রীশিশুর স্তনবৃন্ত পুরুষশিশুর চেয়ে সুস্পষ্ট হতে দেখা যায়। সাধারণত আট থেকে তের বছরের মধ্যে (গড়ে এগার বছর) এর শুরু হয়ে তের থেকে আঠার বছর (গড়ে পনের বছর) বয়সের মধ্যে পরিণত হয়। মাসিক শুরু ও স্তনবিকাশের শুরুর মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় আড়াই বছর। স্তনের বিকাশ ও বস্তিকেশোদ্গম প্রায় সমসময়েই ঘটে থাকে।

স্তনের বৃদ্ধি ও বিকাশকে শরীরতত্ত্ববিদগণ পাঁচটি স্তরে ভাগ করে থাকেন।[৬১] প্রথম স্তরে, প্রাক্-কৈশোরে স্তনবৃন্তই (nipple) শুধু খানিক প্রকট। দ্বিতীয় স্তরে, আট থেকে তের বছর বয়সে স্তনবৃন্তকে ঘিরে স্তনমুকুলোদ্গম হয়। তৃতীয় স্তরে, স্তন আরো উন্নত হয়, স্তনবৃন্তের প্রকটতা বৃদ্ধি পায় এবং বৃন্তকে ঘিরে রঙীন বৃন্তবলয়েরও (areaola) পরিধিবিস্তার ঘটে। চতুর্থ স্তরে, স্তনের মূল অংশ থেকে স্তনবৃন্ত ও তার বৃন্তবলয় বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম স্তরে, স্তনবৃন্ত উৎক্ষিপ্ত হয় ও স্তনের আয়তনের পরিপূর্ণতা ঘটে। দ্বিতীয় স্তর থেকে পঞ্চম স্তর পর্যন্ত পরিণতির সময় লাগে প্রায় সাড়ে চার



কিশোরীস্তনের ক্রমবিকাশ ঃ বহিরংগ ও অন্তরংগ পরিবর্তন
(প্রথম স্তর অর্থাৎ প্রাকবয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থার চিত্র বাহুল্যবোধে বর্জিত)

বছর। কিশোরী-স্তনের ক্রমবিকাশের এই স্তরভেদ শুধু বিজ্ঞানী কেন, রসিক কবিদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই পদাবলীকারের রচনায় দেখি—

পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য় পিড়এ অনঙ্গ॥
সে পুন ভএ গেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর॥[৬২]

স্তনের এই বৃদ্ধি ও বিকাশের পিছনে থাকে দুগ্ধগ্রন্থির উদ্ভব ও বিকাশ এবং গ্রন্থিনালীগুলির আকার ও সংখ্যাবৃদ্ধি, আর তাছাড়া এইস্থানে চর্বি জমা হওয়া। তাই স্তনের আকার ও আয়তন কিশোরীর খাদ্য, পুষ্টি, পৃথুলতা বা কৃশতা ইত্যাদির ওপরে নির্ভরশীল। সেইসংগে স্তনের দৃঢ়তা ও শিথিলতাও নির্ভর করে দুগ্ধগ্রন্থির অবস্থার ওপর, যা কিনা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা শিশুকে দুগ্ধদানের অবস্থায় বেশ ধরা পড়ে।

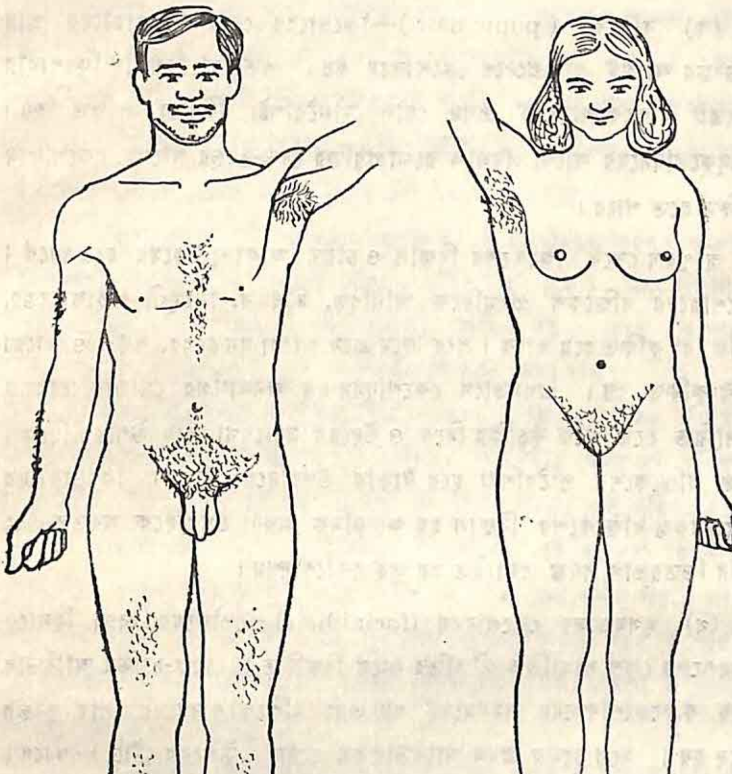
সৌন্দর্য ও কামনার আবেদনসমৃদ্ধ এই স্তনবিকাশ কিশোরীর মনোজগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবির ভাষায়[৬২]—

নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে আপন পয়োধর হেরি॥

সদ্যোত্থিত নিজ পয়োধর সম্পর্কে স্বভাবতই কিশোরীমন খুবই সচেতন থাকে। তাই স্তনের আকার-আয়তন সামাজিক চলতি ধারণা অনুযায়ী ঠিকমত হল কিনা সে বিষয়ে কিশোরীর চিন্তা ব্যাপৃত থাকে, অন্যথা হলে দুশ্চিন্তা চাড়া দিয়ে ওঠে।

২। **কেশোদ্গম**ঃ গৌণ যৌনচরিত্রের অন্যতম দিকচিহ্ন হ'ল কেশোদ্গম। যৌনোদ্গমের ইংরাজী পরিভাষা puberty শব্দটা এসেছে ল্যাটিন 'pubescere' থেকে যার অর্থ হল 'চুল দিয়ে ঢাকা'। এই শব্দ-ব্যুৎপত্তিতত্ত্বেই নির্ধারিত হয়েছে যে কেশোদ্গম যৌনোদ্গমের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। মানবদেহে চুল গজানোর প্রধান জায়গা হল মাথা—এখানে কেশবিকাশের ততটা লিংগভেদ না থাকলেও স্ত্রীলোকের চুল ঘন ও দীর্ঘতর হতে দেখা যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে কপালের পার্শ্বভাগে চুলের স্বল্পতা থাকতে পারে।

আর, যাকে বলা যায় যৌন কেশ অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে যৌনবিকাশের সংগে যে কেশোদ্গমের বিশেষ সম্পর্ক তার অবস্থান হ'ল পুরুষের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে (গোঁফ-দাড়ি) আর বুকে (রোমশ বক্ষ) এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে



বয়ঃসন্ধির কেশোদ্গমের লিংগভেদে বিন্যাসবৈশিষ্ট্য

কক্ষে (বগলে) ও বস্তিপ্রদেশে (তলপেটে)। কক্ষকেশ ও বস্তিকেশ স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের বেশী থাকে।

(ক) বস্তিকেশ (pubic hair)—কিশোরের চেয়ে কিশোরীদের প্রায় দেড়বছর আগেই বস্তিপ্রদেশে কেশোদ্গম হয়। শতকরা বিশভাগ কিশোরীর ক্ষেত্রেই বস্তিকেশোদ্গমই প্রথম গৌণ যৌনবৈশিষ্ট্য হিসাবে লক্ষিত হয়। স্তনমুকুলোদ্গমের আগে, এমনকি রজোপ্রবৃত্তির দেড়-দুবছর আগেই, কেশোদ্গম লক্ষিত হতে পারে।

স্ত্রীপুরুষ ভেদে বস্তিকেশের বিন্যাস ও চরিত্র আলাদা রকমের হয়ে থাকে। কিশোরদের বস্তিকেশ প্রথমদিকে অনিবিড়, দীর্ঘতর, নিম্নমুখী ও হাল্কারঙের, সোজা বা কুঞ্চিত হয়ে থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আরো ঘন রঙের, কর্কশ ও আরো বেশী কুঞ্চিত হয়। প্রথমভাগে কেশোদ্গম হয় জননাংগের গোড়ায়, তারপর প্রসারিত হতে থাকে কুঁচকির দিকে ও উদরের মধ্যরেখা বেয়ে উপরের দিকে। ফলে বস্তিকেশের পুংবৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় উপরদিকে উত্তল। কিশোরীদের ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তিকেশের বিন্যাস হয় অনুভূমিক অথবা উপরদিকে অবতল এবং উরুর ভিতরভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয় এই কেশোদ্গম।

(খ) মুখমণ্ডলের কেশোদ্গম (facial hair)—পৌরুষের ধ্বজা হিসাবে মুখমণ্ডলের কেশ সামাজিক স্বীকৃতির সংগে বিজড়িত। গোঁফ-দাড়ির আবির্ভাব প্রায় কক্ষকেশোদ্গমের সমসময়েই হয় এবং বস্তিকেশোদ্গমের প্রায় দুবছর বাদে হয়। মুখে চুলের প্রথম আবির্ভাব হয় ওষ্ঠের (উপরের ঠোঁট) কোণে; তারপর তা এগিয়ে যায় ওষ্ঠের মধ্যভাগের দিকে এবং সমস্ত ওষ্ঠব্যেপে গোঁফের রেখার সৃষ্টি হয়। এই গোঁফগজানো শুরু হয় সাড়ে তের থেকে সাড়ে চৌদ্দ বছরের মধ্যে। মুখমণ্ডলে অতঃপর চুল গজায় কপোলদেশের উপরিভাগে ও অধরের (নীচের ঠোঁট) নিম্নভাগে। ক্রমে তা পাশে ও নীচের দিকে চিবুক পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে দাড়ির জন্ম দেয়।

(গ) কক্ষকেশ (axillary hair)—কিশোর-কিশোরী উভয়েরই কক্ষদেশে চুল গজায় তলপেটে চুল গজানোর প্রায় দু-তিন বছর পরে। কিশোরের কক্ষকেশ সাধারণত কিশোরীর চেয়ে নিবিড় ও দীর্ঘতর হয়ে থাকে।

(ঘ) বক্ষকেশ ও শরীরের অন্যান্য স্থানের লোমশতা—বক্ষদেশে, উরু ও জঙ্ঘায়, প্রগণ্ড ও প্রকোষ্ঠে দীর্ঘ রোমোদ্গম পুরুষের বৈশিষ্ট্য। কিশোর

বয়সেই এই লোমশতার অংকুরোদ্গম হয় কক্ষকেশোদ্গমের প্রায় সমসময়েই। পরবর্তীকালে তার ব্যাপ্তিবৃদ্ধি ঘটে মাত্র।

গোঁফদাড়ি গজানো বা শারীরিক লোমশতার ব্যাপারে স্বাস্থ্য, পুষ্টি বা অন্তঃরসের প্রভাব ছাড়াও পুরুষানুক্রমের প্রভাব বর্তমান। কোনো কোনো কিশোরের তাই অনেক বেশী গোঁফদাড়ি গজানো বা রোমশতা দেখা যায়। অনেক কিশোরকে আবার মাকুন্দা বা নির্লোম-বক্ষ রূপেও দেখতে পাওয়া যায়। কিশোরীর মাথার চুলের ক্ষেত্রেও প্রায় এক কথাই বলা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে যৌনকেশোদ্গমের প্রধান কারণ পুংযৌনরস ক্ষরণ। শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় দুই গ্রন্থি থেকেই পুংযৌনরস ক্ষরণ হয়ে থাকে। তবে স্বভাবতই শুক্রাশয় থেকে এই অন্তঃরস বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হয়। ফলে কিশোরের যৌনকেশ কিশোরীর থেকে বেশী ও নিবিড়তর হতে দেখা যায়।

৩। **স্বর পরিবর্তন:** স্বরযন্ত্রের (larynx) বৃদ্ধির ফলে স্বর গভীরতর হওয়া বয়ঃসন্ধিকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিশোরীর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সামান্যই। কিন্তু পুংযৌনরসের প্রভাবে কিশোরের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বেশ প্রকট। ক্রমে ক্রমে অথবা হঠাৎ-ঘটা কৈশোরের এই স্বরভংগ কিশোরের পক্ষে এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করে, কিন্তু সে যে পৌরুষ অর্জন করছে তারও নির্দেশ করে। কেননা এই স্বরের গভীরতা না এলে বুঝতে হবে কিশোরটির যৌনবিকাশ নিয়মমত ঘটছে না। খোজা বালকদের স্বরের মেয়েলী তীক্ষ্ণতা ও গীতিময়তার কথা ইতিহাসে মেলে।

৪। **চর্মবর্ণের পরিবর্তন:** বয়ঃসন্ধিকালে চামড়ার তলায় চর্বি জমা হওয়ায় বিশেষ করে কিশোরীদের ক্ষেত্রে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে—লাবণ্যময়ী কিশোরীর সৃষ্টি হয়। সেই সংগে দেহত্বকের বিভিন্ন স্থানে চামড়ার রং গাঢ়তর হয়। যোনীদ্বারে, চক্ষুকে ঘিরে, ঠোঁটেমুখে, স্তনবৃন্তকে ঘিরে ও উদরদেশের চামড়ায় গাঢ় রং (melanin) জমা হয়। কিশোরের মুষ্কথলি ও শিশ্নের চামড়াও গাঢ় রং ধারণ করে।

৮

বয়ঃসন্ধিকালে অন্তঃরসের প্রভাব

অন্তঃরস (hormone) হ'ল কতকগুলি রাসায়নিক যৌগ যা অনাল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ (endocrine glands) থেকে ক্ষরিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে গিয়ে শরীরের নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গে কার্যকরী হয়। এ পর্যন্ত যেক'টি অন্তঃরস আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, কতকগুলি আবার বয়ঃসন্ধির শারীরিক ও যৌনবিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ।

শৈশব থেকে কৈশোরে পরিবর্তন এক ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়া। কৈশোরের শারীরিক ও যৌন পরিবর্তনগুলির অন্যতম কারণ হ'ল অন্তঃরসগুলির কার্যকারিতার প্রভাব এবং সে এক জটিল পরস্পর-সমন্বিত প্রক্রিয়া। যেমন ধরা যাক, এই সময়ের যে দৈহিক দৈর্ঘ্য ও ওজনের বৃদ্ধি ঘটে তার পিছনে থাকে শর্করা-প্রোটিন-স্নেহ উপাদানের বিপাক ক্রিয়া, আবার এই সব বিপাক ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বৃদ্ধিপোষক অন্তঃরসগুলি। আবার, যৌনবিকাশের পিছনে আছে যে যৌনগ্রন্থিগুলির প্রভাব, তাদের সম্যক বৃদ্ধি-বিকাশের জন্যও দায়ী হ'ল ঐ বৃদ্ধিপোষক রস। পিটুইটারী থেকে বৃদ্ধিপোষক রস (somatotropin) প্রত্যক্ষভাবে দেহের বৃদ্ধির দায়িত্ব যেমন বহন করে, তেমনি ঐ গ্রন্থি থেকে আর একটি রস থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপনা যুগিয়ে পরোক্ষভাবে দেহবৃদ্ধির কারণ হয়।

বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া কিন্তু পিটুইটারী বা যৌনগ্রন্থির কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে না—তা মূলত নির্ভর করে হাইপোথ্যালামাস ও উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণতাপ্রাপ্তির ওপর। হাইপোথ্যালামাস হ'ল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংগ। অধুনা জানা গেছে যে এই অংগ পিটুইটারীজাত গ্রন্থি-উদ্দীপক হর্মোনের নিয়ন্ত্রণকর্তা। এর থেকে স্নায়ুযোজকের মাধ্যমেই হোক বা রাসায়নিক ক্ষরণপ্রবর্তক রসের (releasing factor) দ্বারাই হোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ অন্তঃরসের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণভাবে এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পিটুইটারী গ্রন্থির সঙ্গে। হাইপোথ্যালামাস থেকে স্নায়ুযোগাযোগের প্রভাবে পিটুইটারীর পশ্চাদভাগ থেকে ভেসোপ্রেসিন (vasopressin) ও অক্সিটোসিন (oxytocin) নিঃসৃত হয়। আর,

হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত সোমটোট্রপিন প্রবর্তকের (SRF) প্রভাবে পিটুইটারীর সম্মুখভাগ থেকে বৃদ্ধিপোষক রস (somatotropin বা growth hormone), থাইরোট্রপিন প্রবর্তকের (TRF) প্রভাবে থাইরয়েড-উদ্দীপক রস (TSH), কর্টিকোট্রপিন প্রবর্তকের (CRF) প্রভাবে এড্রিনাল-কর্টেক্স উদ্দীপক রস (ACTH) এবং গোনাডোট্রপিন প্রবর্তকের (GRF) প্রভাবে যৌনগ্রন্থি-উদ্দীপক রসযুগল (gonadotropins) ক্ষরিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি-বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ অন্তঃরসই হাইপোথ্যালামাস→পিটুইটারী→অন্তিমগ্রন্থি এই কক্ষপথের প্রক্রিয়াপথে নিঃসৃত হচ্ছে।

বয়ঃসন্ধিকালে অন্তঃরসগুলি পরস্পর অন্বিত জটিল প্রক্রিয়ায় কাজ করে। ঐসব অন্তঃরসগুলির মধ্যে যেগুলি বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, আমাদের আলোচনা সেইগুলির সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। সেই কারণে পিটুইটারীর সম্মুখভাগ থেকে নিঃসৃত রসসমূহ, থাইরয়েড-নিঃসৃত রস ও যৌনগ্রন্থি-নিঃসৃত অন্তঃরসগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

পিটুইটারীর সম্মুখভাগ (Adenohypophysis বা Anterior Pituitary) থেকে এই ক'টি পোষক বা উদ্দীপক (tropic) অন্তঃরসের উদ্ভব হয়—

(১) **বৃদ্ধিপোষক রস (Somatotropin) ঃ** এই অন্তঃরস মৌলভাবে শরীরে নাইট্রোজেন জমা করার বিপাক প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। ফলে দেহকোষের প্রোটিন অংশ বৃদ্ধি পায়, দেহের হাড়-মাসের বৃদ্ধি ঘটে। শরীরের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় প্রধানত এই রসের প্রভাবে। বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের পিছনে এর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া কৈশোরে যে যৌনগ্রন্থির বৃদ্ধিবিকাশ ঘটে তার জন্যেও এই বৃদ্ধি-পোষকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

(২) **থাইরয়েড-উদ্দীপক রস (TSH, Thyrotropin) ঃ** এই রস থাইরয়েড গ্রন্থিকে উজ্জীবিত ক'রে তার থেকে থাইরক্সিন ক্ষরণে সাহায্য করে।

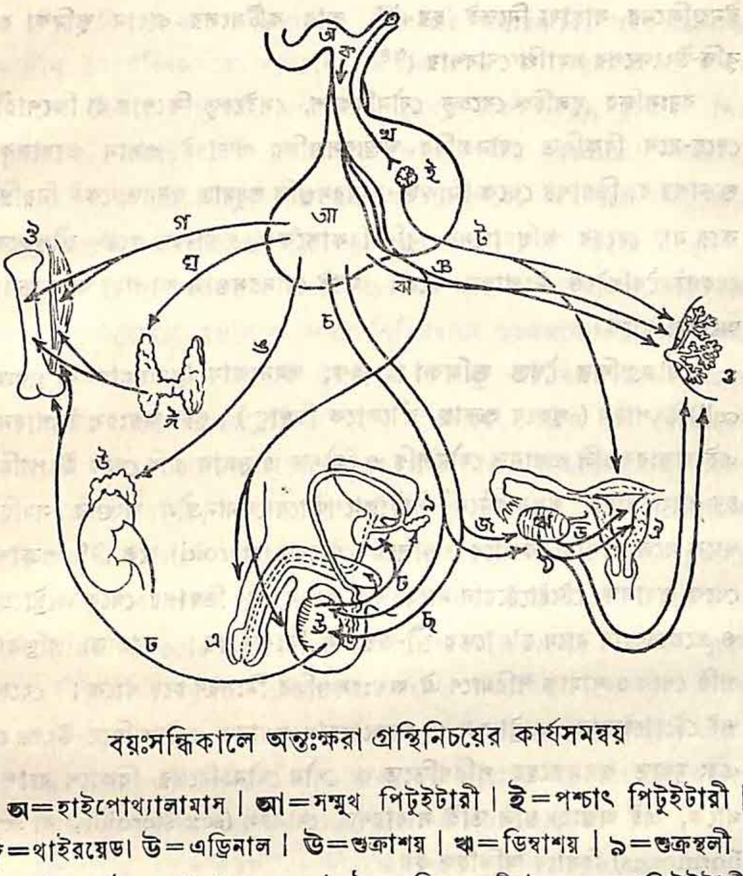
(৩) **এ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিন (ACTH) ঃ** এই রস এড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্স বা বহিঃস্তর থেকে রসক্ষরণের সহায়ক।

(৪) **যৌনগ্রন্থি-উদ্দীপক অন্তঃরসযুগল (Gonadotropins) ঃ** এই রস দুটি লিংগভেদে অভিন্ন, কিন্তু যে গ্রন্থিকে এরা উজ্জীবিত করে তা স্ত্রী-পুরুষে

ভিন্ন, কেননা লিংগভেদে যৌনগ্রন্থিও ভিন্ন। প্রত্যক্ষভাবে এই রসদুটি যৌনগ্রন্থির বৃদ্ধি, বিকাশ ও স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য দায়ী এবং পরোক্ষভাবে গৌণ যৌনবৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ও সংরক্ষণের কারণস্বরূপ। রস দুটির নাম যথাক্রমে ফলিকুল-উদ্দীপক রস (FSH) ও অন্তর্বর্তী কোষোদ্দীপক রস (ICSH বা LH)। পুরুষের ক্ষেত্রে ফলিকল-উদ্দীপক রস (FSH) আসলে বীজোৎপাদক রস। এই রস শুক্রনালীগুলির (seminiferous tubules) প্রযোজক কলাকে (germinal epithelium) বর্ধিত করে এবং শুক্রাণুর (spermatozoa) উৎপাদনে সহায়তা করে। অপরপক্ষে অন্তর্বর্তী কোষ-উদ্দীপক রস (ICSH) লেডিগ কোষগুলিকে (Leydig cells) বিকশিত ও উদ্দীপিত করে ও সেগুলি থেকে পুংরস (testosterone) ক্ষরণে সাহায্য করে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালের শুরু থেকে এই দুই রস চক্রাবর্তনে ক্ষরিত হয়। ফলে, ফলিকুল-উদ্দীপক রস ডিম্বোৎপাদক কলাকে (Graafian follicle) পূর্ণায়ত করে। আর লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) ঐ গ্রাফিয়ান ফলিকুলকে ফাটিয়ে ডিম্বাণু (ovum) নির্গত করতে সাহায্য করে এবং অতঃপর করপাস লিউটিয়াম (corpus luteum) তৈরী করে। এই করপাস লিউটিয়ামেই প্রজেষ্টেরোন (progesterone) নামক এক অন্তঃরস উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ডিম্বাশয়ের অন্তর্বর্তী কোষকলা থেকেও এষ্ট্রোজেন (estrogen) রসের উৎপাদনে সাহায্য করে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, FSH কিশোরীদেহে যৌনোদ্গমে সহায়তা করে এষ্ট্রোজেন উৎপাদনের মাধ্যমে। অপরপক্ষে কিশোরদেহে যৌনোদ্গম হয় LH বা ICSH প্রভাবিত টেষ্টোষ্টেরোন তৈরীর সাহায্যে।

দেহের বাড়-বৃদ্ধির জন্যে পিটুইটারীর সোমাটোট্রপিনের অবদানই একমাত্র কারণ নয়। এই সঙ্গে সহায়ক হিসাবে থাইরয়েড-নিঃসৃত থাইরক্সিনের অবদানও সামান্য নয়। থাইরয়েড গ্রন্থি কণ্ঠের সম্মুখভাবে অবস্থিত। এই গ্রন্থিতে উৎপন্ন থাইরক্সিন দেহের অস্থিমাংসের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। মৌলভাবে এই অন্তঃরস দেহে প্রোটিন সংশ্লেষে সহায়তা করে। স্ত্রী-যৌনরসগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে থাইরক্সিন ঋতুরক্ষায়ও সাহায্য করে। সে কারণে বয়ঃসন্ধিকালে কিছুদিন যাবৎ ঋতুকালীন থাইরয়েড-বৃদ্ধি (puberty goiter) লক্ষিত হয়।

পিটুইটারী ও থাইরয়েড ছাড়াও বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্তঃরস হ'ল অগ্ন্যাশয় (pancreas) নিঃসৃত ইনসুলিন এবং এড্রিনাল



বয়ঃসন্ধিকালে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিনিচয়ের কার্যসমন্বয়

(অ=হাইপোথ্যালামাস | আ=সম্মুখ পিটুইটারী | ই=পশ্চাৎ পিটুইটারী | ঈ=থাইরয়েড। উ=এড্রিনাল | ঊ=শুক্রাশয় | ঋ=ডিম্বাশয় | ঌ=শুক্রস্থলী | এ=শিশ্ন | ঐ=জরায়ু | ও=স্তন | ঔ=অস্থি ও পেশী | ক=সম্মুখ পিটুইটারী ক্ষরণ-প্রবর্তক (releasing factors) | খ=পশ্চাৎ পিটুইটারীর স্নায়ুযোজক | গ=বৃদ্ধিপোষক (somatotropin) | ঘ=থাইরয়েড উদ্দীপক (TSH) | ঙ= এড্রিনাল বহিঃস্তর উদ্দীপক (ACTH) | চ=ফলিকল উদ্দীপক(FSH) | ছ= অন্তর্বর্তী কোষ উদ্দীপক (ICSH) | জ=লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) | ঝ=প্রল্যাকটিন | ঞ=বর্ণকোষ উদ্দীপক (MSH) | ট=অকসিটোসিন | ঠ=এষ্ট্রোজেন | ড=প্রজেষ্টেরোন | ঢ=পুংরস (androgen)

নিঃসৃত কর্টিসল (corstisol)। যথাযথ বৃদ্ধিবিকাশের জন্য সোমাটোট্রপিনকে ইনসুলিনের সাহায্য নিতেই হয়।[৬৩] আর কর্টিসলের প্রধান ভূমিকা হল বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের সমাপ্তি ঘোষণায়।[৬৪]

বয়ঃসন্ধির মূলচিহ্ন যেহেতু যৌনবিকাশ, সেইহেতু কিশোর বা কিশোরীর দেহে-মনে বিকশিত যৌনগ্রন্থির অন্তঃরসগুলির প্রভাবই প্রধান প্রযোজক। শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত যৌনরসগুলি শুধুমাত্র জননতন্ত্রকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, দেহের অস্থিমাংসের বৃদ্ধি-বিকাশকেও প্রভাবিত করে—স্ত্রীপুরুষের দেহগঠনবৈশিষ্ট্যও উৎপাদন করে। তাই যৌনরসগুলি আলাদা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

যৌনগ্রন্থির দ্বৈত ভূমিকাঃ এক, জননকোষ (gamete বা germ cell) উৎপাদন (পুরুষে শুক্রাণু, স্ত্রীলোকে ডিম্বাণু) ; দুই, অন্তঃরস উৎপাদন। এই অন্তঃরসগুলি প্রধানত যৌনগ্রন্থি ও গৌণত এড্রিনাল গ্রন্থি থেকে উৎপাদিত হয় এবং এদের মূলসংগঠনে সাইক্লোপেণ্টানোফেনান্থ্রীন অংগুরি সমন্বিত থাকে বলে রাসায়নিকভাবে এগুলিকে ষ্টেরয়েড (steroid) বলে।[৬৫] শুক্রাশয় থেকে প্রধানত টেষ্টোষ্টেরোন নামে এক পুংরস এবং ডিম্বাশয় থেকে এষ্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টেরোন নামে দু'জাতের স্ত্রী-অন্তঃরস নিঃসৃত হয়। তাছাড়া, এড্রিনাল গ্রন্থি থেকেও সামান্য পরিমাণে ঐ অন্তঃরসগুলির নিঃসরণ হয়ে থাকে। যেহেতু ওই টেষ্টোষ্টেরোন, এষ্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টেরোন প্রধানত যৌনগ্রন্থিতে উৎপন্ন হয় এবং মুখ্যত জননতন্ত্রের পরিণতিতে ও গৌন যৌনচরিত্রের বিকাশে ব্যাপৃত থাকে, এই অন্তঃরসগুলি তাই সাধারণত যৌনরস (sex steroids, বা sex hormones) হিসাবে অভিহিত হয়।

পুংরস (androgen, testosterone) প্রধানত ক্ষরিত হয় অণ্ডকোষের অন্তর্বর্তী লেডিগ কোষ (interstitial Leydig cells) থেকে, এড্রিনাল গ্রন্থির বহিঃস্তর (adrenal cortex) থেকেও সামান্য পরিমাণে। বয়ঃসন্ধিকালে ডিম্বাশয় থেকেও কিছুটা পুংরস নিঃসৃত হয়ে থাকে। শৈশবাবস্থায়ও পুংরস খুব অল্পপরিমাণে থাকে।[৪৪] বয়ঃসন্ধিকালে পিটুইটারী-নিঃসৃত যৌন-উদ্দীপক অন্তঃরসের (gonadotropin ICSH) প্রভাবে এই পুংরসের উৎপাদন উল্লেখ-যোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। দশ থেকে সতের বছর বয়সে রক্তে পুংরসের পরিমান প্রায় কুড়িগুণ বেড়ে যেতে দেখা গেছে।[৬৬]

পুংরসের প্রধান ক্রিয়াকলাপ জননতন্ত্রের বৃদ্ধিবিকাশের বর্ধন ও তদুপরি

বৃদ্ধি-উৎক্ষেপে পেশীবিকাশের উৎসাহদান। সুতরাং পুংরস একাধারে যৌনরস ও বৃদ্ধিরস হিসাবে কাজ করে থাকে। এবং এই অন্তঃরস কিশোরের বয়ঃসন্ধি-কালীন জৈবপরিবর্তনকে আমন্ত্রণের প্রধান ঘটক।[৬৭] জননতন্ত্রের উপর পুংরসের ক্রিয়ায় শুক্রাশয় (testis) ও মুস্কথলি (scrotum), পুরুষাংগ শিশ্ন (penis), প্রোষ্টেট গ্রন্থি (prostate) ও শুক্রস্থলির (seminal vesicle) আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। মূল পরিবর্তন ঘটে শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে—অপরিণত শুক্রনালীগুলি কার্যকরী শুক্রকীট (spermatozoa) তৈরী করার উপযুক্ততা আহরণ ক'রে নিষেকক্ষমতার (fertility) জন্ম দেয়। এই সঙ্গে টেষ্টোষ্টেরোন আনুষংগিক যৌনচরিত্রগুলিকে অর্থাৎ বিভিন্নস্থানে পুরুষজনোচিত কেশোদ্গম, স্বরের গভীরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি উৎপাদন করে। শারীরিক অংগপ্রত্যংগের পুরুষোচিত গড়ন ও পুরুষোচিত যৌন-অভিলাষের সৃষ্টিও এই যৌনরসের অবদান। এছাড়া চামড়ার রঙের গভীরতা বৃদ্ধি আর স্নেহগ্রন্থির (sebaceous gland) ক্রিয়াবৃদ্ধির ফলে ব্রণের সৃষ্টিও পুংরসের কাজ। টেষ্টোষ্টেরোনের বৃদ্ধি-প্রবর্ধক ক্রিয়াকে গঠনাত্মক (anabolic) ক্রিয়া বলে, কেননা পুংরসের প্রভাবে কিশোর লম্বায় বাড়ে, তার পেশীর আকার ও সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে মূলত নাইট্রোজেন আহরণের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষ বাড়ার ফলে। এক্ষেত্রে পুংরস প্রায় পিটুইটারী নির্গত বৃদ্ধিপোষক রসের সমধর্মী। সেইসঙ্গে পুংরস ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসকে দেহমধ্যে ধরে রেখে অস্থিসংগঠনে সাহায্য করে। উপরন্তু অস্থির এপিফিসিসের জুড়ে যাওয়ারও সাহায্য করে এবং সেই কারণে কিশোরের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির সমাপ্তিও সূচিত করে এই পুংযৌনরস।

কিশোরীর বয়ঃসন্ধিকালীন যৌনকেশোদ্গম আংশিকভাবে এই পুংযৌন-রসের অবদান সম্ভবত। এই পুংরস আসে এড্রিনাল গ্রন্থি থেকে, হয়তো খানিকটা আসে ডিম্বাশয় থেকেও। কৈশোরারম্ভে কিশোরীর ব্রণোদ্গমও পুংযৌনরসের কীর্তি। তাছাড়া পুরুষের মতো স্ত্রীলোকের যৌনকামনার উদ্রেকও এই পুংরসের প্রভাবে হয়ে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।[৬৮]

দু'ধরণের স্ত্রীযৌনরস- এষ্ট্রোজেন ও প্রোজেষ্টেরোন প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় ডিম্বাশয়েই ; তাছাড়া এদের অন্যতর উৎস হ'ল এড্রিনালের বহিঃস্তর ও অমরা (placenta)। শৈশবে এষ্ট্রোজেন অল্প পরিমাণে থাকলেও, বয়ঃসন্ধিকালে যৌনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে সাত থেকে বারো বছর বয়ঃক্রমে এষ্ট্রোজেনের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৬৯] ঋতুচক্রের বিভিন্ন স্তরে এষ্ট্রোজেন ক্ষরণের

পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে—ডিম্বস্ফোটনের (ovulation) কালে সর্বোচ্চ পরিমাণ এস্ট্রোজেন রক্তে পাওয়া যায়। স্ত্রীজননাংগ জরায়ু, জরায়ুনালী, যোনীনালী, বহির্যোনী ইত্যাদির পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির সহায়তা করে এস্ট্রোজেন। তাছাড়া স্তনের দুগ্ধগ্রন্থি ও গ্রন্থিনালীর বৃদ্ধি ও সংগঠন এই যৌনরসেরই কাজ। আনুষংগিক স্ত্রীযৌনবৈশিষ্ট্যগুলির সংগঠন ও সংরক্ষণও এর কাজ। পুংরসের মত এস্ট্রোজেনও কিশোরীদেহের বৃদ্ধি সীমিত করে এপিফিসিস সংযোজনের মাধ্যমে। তাছাড়া চোখের কোলে, স্তনবৃন্তবলয়ে ও বহির্যোনীর ত্বকে রঙের গভীরতা সৃষ্টি করে। স্ত্রীদেহের বৈশিষ্ট্য যে পেলবতা, তার উৎপত্তি এস্ট্রোজেন প্রভাবিত স্নেহসংগঠন—চামড়ার তলায়, বিশেষ করে স্তনে ও নিতম্বে চর্বি জমা হয়ে কিশোরীকে "শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাম্"[৭০] রূপে আকর্ষণীয়া ক'রে তোলে।

প্রোজেষ্টেরোনের কার্যবিধি এস্ট্রোজেনের তুলনায় সীমিত, কিন্তু অবহেলা-যোগ্য নয়। কেননা এই অন্তঃরসের নিয়ন্ত্রণে থাকে ডিম্বস্ফোটন ও ভ্রূণধারণের মৌল প্রক্রিয়া। প্রজেষ্টেরোন জরায়ুমধ্যে সেই অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে ক'রে ভ্রূণ জরায়ুমধ্যে সহজে আশ্রয়লাভ করে এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা অবাধে সংরক্ষিত হতে পারে। তাই ডিম্বস্ফোটনের পরবর্তীকালে জরায়ুর অন্তঃস্তরের বৃদ্ধিবিকাশে এই রস সাহায্য করে এস্ট্রোজেনের সহযোগী হিসাবে। তাছাড়া এস্ট্রোজেন প্রভাবিত স্তনগ্রন্থি ও নালীগুলির বৃদ্ধিতেও প্রোজেষ্টেরোনের অবদান বর্তমান। বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্তনবিকাশে এই রসের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রোজেষ্টেরোনের তাপ-উৎপাদক শক্তির জন্য ঋতুচক্রের মধ্যভাগে (midcycle) সামান্য দেহতাপ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

কিশোরীর দেহাভ্যন্তরে যৌনঅন্তঃরসের ক্রিয়াকলাপ খুবই জটিল, কেননা একই সংগে অনেকগুলি অন্তঃরস সহযোগী ও প্রতিযোগী হিসাবে স্ত্রীজননতন্ত্রের চক্র-ক্রম ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। বয়ঃসন্ধিকালের ঠিক আগেই হাইপোথ্যালামাস পূর্ণক্ষম হয় ও পিটুইটারীকে উদ্দীপিত করে। তার ফলে পিটুইটারী থেকে যে দুই যৌনউদ্দীপক রস নিঃসৃত হয়, তা হয় চক্র-ক্রমে। পিটুইটারী থেকে ফলিকূল উদ্দীপক রস (FSH) নির্গত হয়ে ডিম্বাশয়ের ডিম্বোৎপাদক কলাকে বর্ধিত করে।[৭১] পিটুইটারীর অন্তবর্তীকোষ উদ্দীপক রস (L.H) ডিম্বকোষের অন্তর্বর্তী কোষগুলি থেকে এস্ট্রোজেন নির্গত করে। এই এস্ট্রোজেন আবার প্রত্যাবর্তী নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় FSH-এর ক্ষরণ স্তিমিত করে, আর LH এর

ক্ষরণকে প্রশ্রয় দেয়। ফলে LH-এর প্রভাবে ডিম্বস্ফোটন সম্ভব হয়। ডিম্বস্ফোটনের পরে ডিম্বোৎপাদক কলা পরিবর্তিত আকারে কর্পাস লিউটিয়ামে (corpus luteum) পরিণত হলে তা থেকে আবার এষ্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টেরোন নিঃসৃত হয় এবং প্রত্যাবর্তী নিয়ন্ত্রণের ফলে FSH ক্ষরণ স্তিমিত করে রাখে। কর্পাস লিউটিয়ামের কার্যকাল শেষ হলে, অর্থাৎ রজোস্রাব হবার সময়ে এই দুই ডিম্বকোষীয় যৌনরসের ক্ষরণ স্তিমিত হলে, আবার FSH ক্ষরণ শুরু হয় এবং আবার এক নতুন চক্রের শুরু হয়ে যায়। আর, যদি নিষিক্ত ডিম্বাণু ভ্রূণে পরিণত হয়ে গর্ভাধান হয়, তখন কর্পাস লিউটিয়াম বজায় থাকে ও প্রোজেষ্টেরোনের ক্ষরণ সহসা বৃদ্ধি পায়। তার ফলে নতুন ঋতুচক্রের শুরু সম্ভব হয় না, নতুন করে আর FSH ক্ষরণ হতে পারে না বলে।[৭২] FSH আর LH-এর ক্ষমতা দখলের এই চক্র-ক্রমই কিশোরীদেহে ঋতুচক্রের ভিত্তিভূমি।

৯

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক ও যৌন চেতনা

বয়ঃসন্ধিজনিত দৈহিক পরিবর্তনের প্রভাব মানসিক জগতে তীব্র ও প্রগাঢ়। বর্তমান যুগে যখন সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের ফলে জটিলতার নিত্য উদ্ভব ঘটছে, তখন একজন তরুণ একজন বয়ঃপ্রাপ্তের চেয়ে গভীরতর সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে এবং সৃষ্ট এই সমস্যা শুধুমাত্র সমাজের কাছে নয়, তার নিজের কাছেও। যদিও তার দৈহিক, মানসিক ও বোধগত পরিপূর্ণতা পেতে আরো কয়েক বছর দেরী থাকে, তাহলেও একজন কিশোর নিজেকে একজন প্রাপ্ত-বয়স্কের সমান পরিণত বলে মনে করে। "যতই অন্যরা আমাদের খোকা, ছেলেটা বা ভাই বলে সম্বোধন করুক আমরা নিজেদের যুবক বলেই দাবী করতে পারি অনায়াসে।"[৭৩]

নবজাত কৈশোরে একজন বালক বা বালিকা পায় এক নবতর দেহ, যার জৈব বা মানসিক দ্যোতনাও নবতর। এই পরিণতির প্রক্রিয়া লিংগভেদে অবশ্য ভিন্ন। একজন কিশোরীর উপর এই বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভিক প্রভাব অধিকতর। সাহিত্যসম্রাটের ভাষায় বলা যায়—"স্ত্রীলোকের বাল্য হইতে কৈশোরে পরিবর্তন বড় অল্প পরিবর্তন নহে। তখন চরণের চঞ্চলতা নয়ন হরণ করিয়া লয়; উদরের স্থূলতা বক্ষঃ ও জঘন দুই দিগ হইতে ভাগ করিয়া লয়; শাখাঙ্গ সকলের কৃশতা চারিদিগ হইতে একত্র করিয়া কটিদেশ নিজ কক্ষমধ্যে রাখিয়া দেয়।"[৭৪] এই প্রভাবের ফলে সে তার দেহের এইসব বহিরংগের পরিবর্তন সম্পর্কে অধিকতর সজাগ হয়ে পড়ে—নিজ দেহের নবোদ্ভিন্ন অংগ-প্রত্যংগগুলি সম্পর্কে অধিক উৎসুক হয়ে পড়ে। পদাবলীকারের বর্ণনায় দেখা যায়—

"অব সবখন বহু আঁচর হাত ॥"[৬২]

অথবা

"জেহে অবয়ব পুরুষ সময় নিচর বিন্থু বিকার।
সে আবে জাহুতাহু দেখি ঝাপয়ে..."[১৩]

প্রাক্‌বয়ঃসন্ধিকালে একজন বালিকা বালকদের সম্পর্কে বিশেষ কৌতুহলাক্রান্ত থাকে না, বরং সে বালকদের তার প্রতিযোগী বলেই ভাবে।

কৈশোরাগমের প্রথম দিকেও কিশোরীর ভাব থাকে অনেকটা মদ্দা 'টম-বয়' ধরণের। যৌনোদ্গমকালে বেশীর ভাগ কিশোরীই ঋতুস্রাবের আবির্ভাবকে স্বাগত জানায় তার স্বাভাবিক পরিণতির চিহ্ন হিসাবে। ঋতুর আবির্ভাবের বা স্তনোদ্গমের বিলম্ব হলেই বরং তারা উৎকণ্ঠিত হয়। রজঃস্বলা হওয়ার সংগে সংগে কিশোরীদের মধ্যে নম্রতা ও দায়িত্ববোধ জাগতে দেখা যায় এবং তাদের প্রারম্ভিক মদ্দানীভাবটা হ্রাস পেতে থাকে। কেউ কেউ আবার ঋতুস্রাবের শুরুর দিকে বিড়ম্বিত বোধ করে, বিশেষ করে ঐ কারণে যখন সাময়িক শারীরিক অক্ষমতা আসে।

কিশোরীমনের আবেগ নির্ভর করে তার রক্তে চক্রাবর্তিত যৌন-অন্তঃরসের মাত্রার ওপরে। ঋতুচক্রের প্রথমার্ধে যখন এস্ট্রোজেনের প্রভাব বেশী থাকে, তখন সে খুশী ও সজীব থাকে এবং তার যৌনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঋতুচক্রের শেষার্ধে যখন প্রজেস্টেরোনের প্রভাব থাকে বেশী, তখন তার সজীবতা ও সচেতনতা হ্রাস পায়। এবং ঋতুস্রাবের কয়েকদিন আগে যখন দুই অন্তঃরসই হঠাৎ কমে যায় তখন সে কোপনস্বভাব, অবসাদগ্রস্থ ও উদ্বিগ্নতা-সম্পন্ন হয়ে পড়তে পারে।[৭৫]

কিশোরের ক্ষেত্রে কিন্তু অধিকাংশস্থলে বয়ঃসন্ধিকালীন দেহের বাড়বৃদ্ধি এক ঔদ্ধত্যের জন্ম দেয়। যখনই সে নিজের দেহের বৃদ্ধি-বিকাশ অনুভব করে, তখনই সে স্বতন্ত্রতার অনুসন্ধান করে। ফলে সে গুরুজনের আজ্ঞা-পালন সম্পর্কে অবাধ্য হয় এবং পদে পদে প্রতিরোধ প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজস্ব পথে যাবার চেষ্টা করে। "সন্তান বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মাকে যেমন জড়িয়ে থাকে, তেমনি আঘাত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য জাহির করতে চায়। বাবা ছেলের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে। একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ভালবাসার সঙ্গে ঈর্ষা মিশে যায়।"[৬] বয়ঃসন্ধির কিশোর সহপাঠী বা সহকর্মী বন্ধুদের ওপর বেশী আস্থা স্থাপন করে এবং পিতামাতার সঙ্গে বন্ধন আলগা করে ফেলে। "টিনএজ ছেলেমেয়েরা ভাবে বাবা-মা তাদের শত্রু—তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়াই গুরুজনদের একমাত্র কাজ।"[৭৬] তাদের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে কোন রকমের প্রতিবন্ধকতা তাকে আরো অধিকার-সচেতন ও জেদী করে তোলে এবং সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঐ সব চাপানো প্রতিবন্ধকতার অবমাননা করে, যাতে করে তার পরিপূর্ণতা ও স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাকবয়ঃসন্ধিকালে

অথবা বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভে কিশোরেরা সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি সম্পর্কে অসহিষ্ণু থাকে— কোনরকম যৌনতাবোধ ব্যতিরেকেও মেয়েদের জ্বালাতন করে, এমনকি দৈহিক অত্যাচারও করতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালের প্রারম্ভভাগে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে উভকামিতা ও সমকামিতা—দুই-ই লক্ষিত হয়। যৌনোদ্গমের শারীরিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাদের মধ্যে সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘ'টে তাদের উৎক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে। আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রভাবে তারা আত্মদমনের শিক্ষা পেয়ে সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির অবদমন করতেও সক্ষম হয়।

বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ সাধারণত বয়ঃসন্ধির মধ্য ও শেষভাগে ঘটতে দেখা যায়। তার আগে যৌনপরিতৃপ্তির প্রধান উপায় হিসাবে থাকে আত্মরতি বা সমকামিতা। বিশেষ করে, বালকদের ক্ষেত্রে যৌনোদ্গমের অনেক আগেই শুধুমাত্র আমোদের জন্য জননাংগ নাড়াচাড়া করে শক্ত করে তুলতে দেখা গেছে। স্বমেহন বা আত্মরতি সম্পর্কে এক বিলাতী সমীক্ষায় দেখা যায় যে কিশোরীদের ৬০ শতাংশ এবং কিশোরদের ৯০ শতাংশ এই অভ্যাসে অভ্যস্থ থাকে।[৭৭] অপর এক নিরীক্ষায় [৭৮] বলা হয়েছে, কিশোরীদের ১২ শতাংশ বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভে ও ৪০ শতাংশ বয়ঃসন্ধির শেষভাগে আত্মরতিতে অভ্যস্ত থাকে। ভারতীয় কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কে এই ব্যাপারে যদিও কোনো সমীক্ষা-তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তাদের ক্ষেত্রেও এই ধরণের হিসাবের অন্যথা হওয়ার কোন কারণ নেই।

বয়ঃসন্ধিকালে যৌনশিক্ষা

বয়ঃসন্ধিকালে যৌনশিক্ষা দেওয়া দরকার বা উচিত কিনা অথবা সে শিক্ষা দিলে কতটুকু দিতে হবে, এ বিষয়ে চলতি পত্রপত্রিকায়, এমনকি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পত্রিকায়ও, বহুবিধ আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু নির্ভুল পন্থা নির্ণয় এখনো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

বয়ঃসন্ধিতে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সংগে সংগে যৌনজাগরণও ঘটে। এবং অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও কিশোর-কিশোরীদের যৌন-চেতনা খুব দ্রুততালে পরিবর্তিত হচ্ছে। তবু এইযুগেও যখন কিশোর-সমাজের সামনে পরিবর্তনশীল জগতের অবস্থা পরিদৃশ্যমান, তখনো সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তিকর পুরনো প্রচলিত ভাবধারার বাধা এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

দেহমনের অর্ধপরিণত অবস্থায় যেসব উত্তেজনার জন্য কিশোর-কিশোরীরা প্রস্তুত থাকে না, বয়ঃসন্ধিকালে সেইসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। সুতরাং সেগুলো যথাযথ সামলে ওঠা তাদের পক্ষে খুবই দুরূহ হয়। বিশেষ করে, অধুনাতন বাধাবন্ধনহীন সমাজে তারা যখন বিভিন্ন প্রলোভনের প্রকোপে পড়ছে, তখন এই বর্ধনশীল অবস্থায় তারা তাদের অজ্ঞানতার দরুণ সহজেই বিপথগামী হতে পারে। সিনেমা থিয়েটারের পোষ্টার, ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন থেকে সুরু করে অশ্লীল সাহিত্য তাদের সামনে হাজির হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় আজ। এবং এই সব সামাজিক আয়োজনের সামনে পড়ে তারা উত্তেজিত হবে না, বা সাড়া দেবে না এচিন্তা বাতুলতা মাত্র। আজ যদি তারা বলে—"বেশ করবো, আমাদের যা খুশী তাই করবো। তাতে সমাজের কী? সমাজ যখন মজার জন্য এবং টাকার লোভে সিনেমা বিজ্ঞাপনে, টিভিতে, পোষ্টারে, রাস্তায় হোর্ডিংয়ে সেক্স ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন দোষ হচ্ছে না! দোষ হয়, আমরা যখন নিজেদের পথে নিজেদের শান্ত করবার চেষ্টা করি।"[১৬] —তখন নিশ্চয়ই আমাদের জবাব জোগাবে না।

বয়ঃসন্ধির প্রথমভাগে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা হঠাৎ যৌন-সচেতন হয়ে পড়ে তাদের দেহে যৌনবিকাশের লক্ষণগুলি স্পষ্টতর হওয়ার সংগে সংগে। আবার স্কুল ছেড়ে যখন কলেজে পদার্পণ করে, তখন স্কুল জীবনের কঠোর শাসনের আবহাওয়া থেকে হঠাৎ মুক্তির আস্বাদ তাদের আরো বিচলিত করে তোলে—তারা বহু প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়ে। এবং এইসব বিপত্তি আসে প্রধানত তাদের যথার্থ শিক্ষার অভাবে বা লুকিয়ে চুরিয়ে পাওয়া অর্ধশিক্ষা বা ভুল শিক্ষার ফলে। তাই যথাসময়েই যদি তারা দেহমনের বিকাশের সংগে সংগে অর্জিত যৌনবিকাশের যথার্থ পটভূমি ও স্বাভাবিক পরিণতির জ্ঞান লাভ করে, তাহলে অপরিণতত্বের জন্য যে বিপদ আসার কথা, তা সম্ভবত নাও আসতে পারে। যৌন ব্যাপারে বহু প্রশ্নের উত্তর যদি তাদের জানা থাকে, তাহলে অহেতুক কৌতূহল তাদের পীড়িত করবে না, স্বাভাবিকভাবেই তাদের যৌনবিকাশের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

যৌনশিক্ষাদানের প্রচলিত ধারণায় বয়ঃসন্ধির বয়ঃক্রমকে দশ থেকে চৌদ্দ এবং পনের থেকে উনিশ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকের মতে এই ব্যাপারে কোনো বয়ঃস্তরকেই কাঁচা বয়স বলে ধরা ঠিক নয়। কেননা অনেক শিশুও যৌনসম্পর্কিত ব্যাপারে নানা জটিল প্রশ্ন করতে পারে, এবং

তখন সেই শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য অভিভাবক বা শিক্ষকদের উচিত কোনরকম আমতা আমতা না করে সরল ও সত্য জবাব দেওয়া। সত্যি বলতে কি যৌনজ্ঞানকে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম হিসাবে দেখার চেয়ে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় আহরিত সাধারণ জ্ঞানের অংশ হিসাবে দেখা উচিত। তবু চিন্তাধারার পরিপক্কতা হিসাব করে ফরাসী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যৌনশিক্ষাক্রমে মোটামুটি এই রকম নিয়ম চালু আছে যে প্রথম ভাগে এগার থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শেখানো হবে শুধুমাত্র যৌনতথ্যগুলি, যেমন যৌনযন্ত্রগুলির গঠন ও ক্রিয়া, আনুষঙ্গিক যৌনবৈশিষ্ট্য ও বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে ঋতুচক্র ও রজোস্রাব সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ধারণা ; এবং দ্বিতীয় বিভাগে পনের থেকে উনিশ বছর বয়সে শেখানো হবে বয়সের পরিপক্কতা অনুযায়ী আরো যুক্তিযুক্ত প্রকৃত যৌনজ্ঞান, যেমন, গর্ভাধান ও ভ্রূণতত্ত্ব, গর্ভনিরোধ, যৌনরোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত ধারণা। আমাদের দেশেও স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর জন্য যৌনতথ্য সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নির্ধারিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্কুলকর্তৃপক্ষ ও শিক্ষাব্রতীরা এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী হয়ে ওঠেন নি।

কিশোরীদের ক্ষেত্রে দেহগত পরিবর্তনের আগেই যৌনশিক্ষা শুরু হওয়া প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধির বালিকা তার মা, বান্ধবী বা আত্মীয়াদের কাছে তার ঋতুস্রাব সম্পর্কে যে তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করে, তা সর্বথা বিজ্ঞানসম্মত নয়। যৌনশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে সে অন্তত এই সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত যে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নিতে পারতো এবং ভবিষ্যতের অনেক স্বাস্থ্যগত জটিলতা নিবারণ করা সম্ভব হতো।

বয়ঃসন্ধিকালীন যৌনশিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্ধারণ কঠিন, কিন্তু এ শিক্ষার মূল সূত্র এমন হওয়া উচিত যাতে এ শিক্ষা কৈশোরে দেহমনের স্বাভাবিক বিকাশের পথনির্দেশক হয়। এ বিষয়ে স্যার নর্মান জেফকোটের[৭৯] সাবধানবাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"If sex education was neglected in the past it may now suffer from over-emphasis. The uninhibited adolescent who knows everything may be less well fitted for maturity than is the demure miss whose innocence thrives on ignorance and romantic ideas. Innocence is often a better protector than is knowledge"

১০

বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধিবৈকল্য

বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ে যখন নিয়মিত বৃদ্ধিহার, অর্থাৎ বছরপ্রতি কত সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বাড়লো, মাপা যায়। এই-ভাবে মাপতে গেলে হাড়ের বাড়ের যে অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ে তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়—বামনত্ব আর অতিদীর্ঘত্ব।

বামনত্ব অর্থাৎ দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিহারে হ্রস্বতা বয়ঃসন্ধিকালে, বিশেষ করে কিশোরের পক্ষে, দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আরো বিপদের কথা এই যে লম্বা হবার বিভিন্ন ওষুধপত্র বা ব্যায়ামাদির কাগুজে উপদেশ ও বিজ্ঞাপন স্বল্পবুদ্ধি কিশোরদের বিভ্রান্ত করে তোলে।

সাধারণত বৃদ্ধিহ্রাসের কারণ [৮০] অস্থি'র রোগ, পুরুষানুক্রমে আগত ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকত্ব, দীর্ঘকালীন অসুস্থতা, হৃদরোগ, বৃক্করোগ, তারুণ্যকালীন মধুমেহ ইত্যাদি। তাছাড়া যথাযথ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা পেটের গণ্ডগোলের কারণে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবেও অস্থিবৃদ্ধির হার কমতে পারে। তবে এই পুষ্টি বা ক্যালোরীর অভাবজনিত বামনত্ব-বৈকল্যে বয়স অনুযায়ী ওজনের হ্রাসই বেশী হয় বয়সানুপাতী দৈর্ঘ্যহ্রাসের চেয়ে। শিশুকাল থেকে যদি থাইরয়েড গ্রন্থির গোলমাল থাকে তাহলেও বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। দেহযন্ত্রের কোন গোলযোগ না থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক বা পুরুষানুক্রমিক ধারার প্রভাবেও বহু সময় বৃদ্ধিহার হ্রাস বা বৃদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে। এর মধ্যে বংশানুক্রমিক কারণজনিত বামনত্ব খুব ছোটবেলা থেকেই পরিলক্ষিত হয় এবং পরিবারের অন্যান্যদেরও সমান ধরণের বাড়ে অল্পতা দেখা যায়। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে যৌনোদ্গম যথাসময়ে হাজির হতে বাধা নেই। উল্টোদিকে, অন্তঃরসের অল্পতা থাকলে অনেক সময় বৃদ্ধিহার যথাযথ থাকলেও যৌনোদ্গম বিলম্বিত হয়। এসব ক্ষেত্রে পরবর্তী কোনো সময়ে বৃদ্ধি-উৎক্ষেপ ঘটতে পারে এবং স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যলাভও অসম্ভব নয়। পুষ্টির অভাব, বিশেষত প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব, বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রবল বাধাস্বরূপ।

বামনত্বের সংগে গৌণ যৌনবৈশিষ্ট্যের বিলম্বিত আবির্ভাব প্রায়শই অংগাংগী জড়িত। তাই এই অবস্থায় অনেক সময়েই পুংযৌনরস প্রয়োগ প্রক্রিয়া

অনুমোদিত হয়। তার ফলে বৃদ্ধিহার কিছুটা বাড়ে এবং যৌনলক্ষণগুলিও প্রকটিত হয় বটে, কিন্তু ঐ অন্তঃরসের প্রভাবে হাড়ের এপিফিসিস জুড়ে গেলে দৈর্ঘ্যে বাড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য উপচিতিদায়ক ঔষধ (anabolic steroid) প্রয়োগে এপিফিসিস সংযোজন ব্যতিরেকেই বৃদ্ধিহার বাড়ানো সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বংশান্বয়জনিত বামনত্বে কোনো ঔষধ বা প্রক্রিয়াই কার্যকরী হতে পারে না।

বয়ঃসন্ধিকালে **অতিদীর্ঘত্ব** অর্থাৎ দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিহার বাড়া, বিশেষ করে কিশোরীদের ক্ষেত্রে, নিজের ও পরিবারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'লম্বুরাণী' তার বান্ধবীদের ঠাট্টায় এমন অস্বস্তি বোধ করে যে কারো সামনে আসতে লজ্জা পায়। ফলত সে মানসিক বৈকল্যও ভোগ করতে পারে।

অতিদীর্ঘতার কারণ ধাতগত বা স্বভাবজ, বৃদ্ধিপোষক রসের আধিক্য, বংশগত, মধুমেহ (প্রাথমিক অবস্থা) এবং মস্তিষ্ক-নির্ধারিত দানবত্ব। সাধারণভাবে ধাতগত, বংশগত ও পুষ্টিগত কারণগুলিই প্রধান। পিটুইটারী-নিঃসৃত বৃদ্ধিপোষক রসের অতিক্ষরণের ফলে হাড়গুলো লম্বায় এত বাড়ে যে বয়ঃসন্ধিকালে এক দানবাকৃতি (gigantism) ধারণ করে।

লম্বায় বাড়ার পরেই দ্বিতীয় বৃদ্ধি-সমস্যা হ'ল প্রস্থবৃদ্ধি বা **স্থূলতা**[৮১]। বয়ঃসন্ধিকালে এই স্থূলতা কি কিশোর কি কিশোরী উভয়ের ক্ষেত্রেই বিশাল সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রাথমিক স্তরে সন্তানের ওজনের অতিবৃদ্ধি কোন পিতামাতারই নজর আকর্ষণ করে না। কেননা একারণে শিশুর শারীরিক কোন ক্ষতি তো লক্ষিত হয়ই না, পরন্তু বেশ গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট শিশু প্রশংসা কুড়িয়ে থাকে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে এসে এই চর্বির আধিক্যজনিত স্থূলতা এক স্বাস্থ্যগত সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়, কারণ এই স্থূলতা শতকরা প্রায় আশিভাগ ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেও বজায় থাকে[৮২]।

শৈশব থেকে বয়ঃপ্রাপ্তির মাঝে দেহের চর্বিকোষগুলি সংখ্যায় চার-পাঁচ গুণ বাড়ে। সাধারণতঃ পাঁচ থেকে পনের বছরের মধ্যে বয়সের সঙ্গে তাল রেখে চর্বিকোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু স্থূলতা রোগে চর্বিকোষের সংখ্যা ও আয়তন দুইই বাড়ে। ওজন কমাবার প্রক্রিয়ার ফলে এই স্থূলতা রোগীদের চর্বিকোষের আয়তন কমে বটে, কিন্তু সংখ্যার হ্রাস ঘটানো সম্ভব হয় না।

বয়ঃসন্ধিকালীন স্থূলতার কারণ প্রধানত বংশানুক্রম, অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ (বিশেষ করে শর্করা জাতীয় খাদ্য), শারীরিক ব্যায়ামের স্বল্পতা ও অন্তঃরসের

দুষ্টক্রিয়াজনিত বিপাক-বৈকল্য। এগুলির মধ্যে সব থেকে বেশীক্ষেত্রে ঘটে থাকে পুষ্টিগত ও বংশানুক্রমিক কারণগুলি। যে পরিবারের অধিকাংশ লোক মোটা, আর যে সব স্বচ্ছল পরিবারে খাওয়াদাওয়ার প্রাচুর্য আছে, সেই সব পরিবারেই স্বভাবত গোলগাল মোটাসোটা কিশোর-কিশোরীর দেখা মেলে।

যদিও মেদাধিক্যের সমস্যা বেশীই ঘটে, তবে তার উল্টোটা অর্থাৎ অপুষ্টিজনিত কৃশতার সমস্যাও অপ্রচুর নয়, বিশেষ করে এই দারিদ্র্যের দেশে। যথাযথ সুষম খাদ্যের অভাব, অথবা খাদ্যের বাছবিচারের বাড়াবাড়ি ছাড়াও, ধর্মাচরণের জন্য উপবাস পালনাদির আধিক্য বহুসময়েই অপরিপুষ্টিজনিত ওজনহ্রাস ঘটাতে পারে। তাছাড়া মানসিক ক্ষুধামান্দ্য (anorexia nervosa) রোগে কিশোরীদের খুবই ভুগতে দেখা যায়। খেলেই মেদ জ'মে ফিগার নষ্ট ক'রে দেবে এই ভয় এমনই শিকড় গেড়ে তাদের মনে বসে যায় যে না খেয়ে খেয়ে তারা দিন দিন রোগা হয়ে যেতে থাকে, অপুষ্টির সব লক্ষণই তাদের মধ্যে হাজির হয়।

সুতরাং বয়ঃসন্ধিকালে খাদ্যগ্রহণের নিয়মকানুনগুলি বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। এই উঠতি বয়সে হাড়ে-মাসে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও ওজনে বাড়ার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু, বিশেষ করে দেহকোষ গঠনের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত প্রোটিন জাতীয় খাদ্যবস্তুর, বিশেষ প্রয়োজন হয়। আবার উল্টোদিকে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ, বিশেষ করে শর্করা জাতীয় খাদ্যের আধিক্য, স্থূলত্ব সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই বয়ঃসন্ধিকালে ওজন কমাবার প্রক্রিয়া হিসাবে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমানোর বিষয়ে গভীর চিন্তার প্রয়োজন। অহেতুক খাদ্যহ্রাস (dieting) কৈশোরের স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে পারে। উপরন্তু খাদ্যবঞ্চনার কারণে মানসিক ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে ওজন কমানোর, বা সোজা কথায় মেদ-হ্রাসের, বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া হল এই উঠতি বয়ঃক্রমের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে চর্বিসংস্থান আর বাড়তে না দেওয়া। আর, তার প্রধান উপায়ই হ'ল শরীরচর্চার মাধ্যমে শারীরিক ক্রিয়াকর্ম বাড়ানো। কৈশোরে ব্যায়াম অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়া তাই বিশেষভাবে প্রশস্ত। ওজন কমানোর জন্য ওষুধপত্রের ব্যবহার খুব একটা সন্তোষজনক নয়, বিশেষ করে এগুলিকে যখন দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে বর্ধিষ্ণু বয়ঃসন্ধির দেহে মনে বহু কুফল প্রসব করতে দেখা গেছে। অতিমাত্রায় স্থূল রোগীদের ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও অনুমোদিত। এই ধরনের চিকিৎসায় প্রধানত খাদ্যগ্রহণ স্বভাবের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে।

১১

বয়ঃসন্ধির জনন-বৈকল্য

যৌনগ্রন্থি ও জনন-যন্ত্রের অনেক গোলমালই শৈশব বা এমনকি জন্মের আগে থেকেই থাকতে পারে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে এসেই এগুলো ধরা পড়ে কারণ এই বয়সেই ঐসব যন্ত্রের কার্যকলাপ শুরু হয়। জননযন্ত্রের অনেক গোলমালই যৌনগ্রন্থির কোন গোলযোগ ছাড়াই ঘটতে পারে। আবার বয়ঃসন্ধিকালে যথাযথ যৌনবিকাশের অভাবেও জননযন্ত্রের অস্বাভাবিকত্ব জন্মাতে পারে।

পুরুষের ক্ষেত্রে জননযন্ত্রের অস্বাভাবিকতা প্রধানতঃ ক্ষুদ্রশিশ্ন, ক্ষুদ্রমুষ্ক, ক্লীবত্ব, শুক্রাশয়ের অস্বাভাবিক অবস্থান ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সবথেকে বেশী পাওয়া যায় "গুপ্ত শুক্রাশয়" (cryptorchidism) অবস্থাটি। এই অস্বাভাবিকতায় মুষ্কথলিতে শুক্রাশয়ের স্বাভাবিক অবতরণ অনুপস্থিত বা অসম্পূর্ণ থাকে। জন্মকালে শুক্রাশয়দুটি উদরমধ্যে অবস্থান করে। তারপর বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে গ্রন্থিদুটি কুঁচকির মধ্যে অবস্থিত এক সরুপথ বেয়ে মুষ্কথলির মধ্যে নেমে আসে। বয়ঃসন্ধিকালে ক্ষরিত পুং-যৌনরসের প্রভাবে এই অবতরণ সম্পূর্ণ হয়। এই অবতরণের গতিপথে কোনস্থানে শুক্রাশয়-গ্রন্থির গতি স্তব্ধ হলে তখন আমরা তাকে অসম্পূর্ণ অবতরণ বলি। ফলত, শুক্রাশয় সম্পূর্ণভাবে উদরস্থিত (অনবতরণ, undescended) বা কুঁচকিতে অবস্থিত (অসম্পূর্ণ অবতরণ, incomplete descent) অবস্থায় থাকতে পারে। অথবা অবতরণকালে গ্রন্থিটি কোন কারণে অন্য পথে চালিত হতে পারে, তখন তাকে বলা হয় অপ-অবতরণ (maldescended)। শুক্রাশয়ের অবতরণের এই গোলমাল একদিকে বা দুদিকেই ঘটতে পারে। যে কোনরকম অস্বাভাবিক অবতরণের ফলে শুক্রাশয়কে তার স্বাভাবিক অবস্থান মুষ্কথলিতে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই এই অবস্থার নাম দেওয়া হচ্ছে "গুপ্ত শুক্রাশয়" (cryptorchidism)। কোনরকম অসুবিধা না ঘটা পর্যন্ত এই অস্বাভাবিকতা এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ও অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। নিয়মমাফিক স্বাস্থ্যপরীক্ষাকালে এই অবস্থা হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে পারে। অথবা অসাধারণ অবস্থানের দরুণ অনেক সময় গ্রন্থিটি পাক খেয়ে গিয়ে যন্ত্রণার উদ্ভব হলে তখন ধরা পড়ে।

জন্মগত কোনো বৈকল্যের জন্য অথবা যৌনগ্রন্থিজাত অন্তঃরসের গোলমালে

এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় যখন কৈশোরে পদার্পণ ঘটে, তখন অনবতরিত অণ্ডকোষ আকারে ছোট ও তুলতুলে অবস্থায় থাকে। গ্রন্থিমধ্যস্থ জননকোষগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে এবং শুক্র উৎপাদন ও পুংরস ক্ষরণও অনেক হ্রাস পায়। তাছাড়া পাক খেয়ে গেলে গ্রন্থিটি শুকিয়ে যায় ও সে কারণে জননক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। এই অবস্থায় শৈশব বা কৈশোরের গোড়ার দিকে যৌনগ্রন্থি-উদ্দীপক অন্তঃরস (gonadotropin) ইনজেকশন দিলে অনেক সময় ভাল ফল দেয়। তাছাড়া শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে অণ্ডকোষকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করাও সম্ভব।

কিশোরীদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের অপ-পরিণতি বা গঠন-বৈকল্যের কারণে স্ত্রী-যৌনগ্রন্থির ও জননযন্ত্রের রোগ ঘটতে পারে। তাছাড়া জরায়ু ও যোনীনালীর উৎপত্তিকালেও গোলমাল দেখা দিতে পারে। ভ্রূণতত্ত্বের ধারণায় জরায়ু ও যোনীনালীর ঊর্ধ্বভাগ ম্যুলেরিয়ান নালীর এবং যোনীনালীর নিম্নভাগ ইউরোজেনিটাল সাইনাস থেকে সম্ভূত। এই সম্ভূতিসময়ে ম্যুলেরিয়ান যন্ত্রের গোলমালে অপগঠিত বা অগঠিত জরায়ু অথবা যোনীনালীর জরায়ু-সংযোগ ব্যাহত হতে পারে। জরায়ুর এইসব ত্রুটিপূর্ণ সংগঠন বয়ঃসন্ধির প্রথম ভাগে খুব একটা ধরা পড়ে না, যদি যোনীনালী ও জরায়ুর মধ্যে যোগাযোগ পথ অব্যাহত থেকে নিয়মিত ঋতুস্রাবের ব্যাঘাত না ঘটায়। কিন্তু বয়স একটু বাড়লে চৌদ্দ থেকে উনিশ বছর নাগাদ জননযন্ত্রের এই অপসংগঠন কিছু কিছু স্ত্রীরোগের সৃষ্টি করতে পারে, যেমন ঋতুকৃচ্ছ্রতা, অনিয়মিত ঋতুচক্র বা বিবাহিতার গর্ভাধানে অক্ষমতা।

জননবৈকল্যে অন্তঃরসের প্রভাব

বয়ঃসন্ধিকালে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির কোষকলার বিকাশবৈকল্য, কোষবৃদ্ধি, সংক্রামক রোগ ইত্যাদি কারণে ঐ গ্রন্থিগুলির ক্ষরণে স্বাভাবিকের তুলনায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে ও তার ফলে দেহের বিভিন্ন গঠন ও ক্রিয়ার বৈকল্য জন্মায়। তাছাড়া এই বয়সে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির যে সব গণ্ডগোল হয় তার সংগে প্রায়শই জিন-ঘটিত অস্বাভাবিকত্বের সম্পর্ক থাকতে দেখা যায়। অন্তঃরসের অস্বাভাবিকতার ফলে এই উঠতি বয়সে ধরা পড়ে যাওয়া রোগগুলির মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত করা হ'ল।

(১) **হাইপোথ্যালামাসের গণ্ডগোল ঃ**

(ক) ফ্রলিক্‌স সিণ্ড্রোম (Fröhlich's Syndrome)—হাইপোথ্যালামাসের গ্রন্থিকোষগুলির প্রাথমিক বিকৃতির ফলে স্থূলতা, যৌনাংগের অপরিণতি, নিদ্রাহীনতা, অরজস্বলতা—এই সব ঘটে থাকে।

(খ) লরেন্স-মুন-বিডল সিণ্ড্রোম (Laurence-Moon-Biedl Syndrome)—অটোজোমের জিন-বৈকল্যে জাত এই রোগে পুরুষরাই বেশী ভোগে। যৌনগ্রন্থির অপরিণতি, স্থূলতা, বহু-অংগুলিত্ব, বৃদ্ধিহার হ্রাস ও মানসিক অপরিণতি, অনবতরিত অণ্ডকোষ ইত্যাদি এ'রোগের লক্ষণ।

(গ) পুরুষের টার্নার সিণ্ড্রোম (Male Turner Syndrome)—এই রোগে অণ্ডকোষ অগঠিত, অনবতরিত ও ক্রিয়াশূন্য থাকে। এই সংগে বামনত্ব, ছোট ঘাড়, ঢালের মত ছাতি ইত্যাদি লক্ষণও বর্তমান থাকে।

(২) **পিটুইটারীর গণ্ডগোল ঃ**

(ক) পিটুইটারীর প্রাথমিক ত্রুটি—এ রোগে বামনত্ব ঘটে—দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি-হার বছরে ২-৩ সেঃ মিঃ; রোগী বেঁটে-মোটা চেহারার হয় ও আসল বয়সের থেকে কমবয়সী দেখায়। গৌণ যৌন-চরিত্রগুলি দেরীতে আসে অথবা একেবারেই আসে না। অর্থাৎ প্রাথমিক অরজস্বলতা, যৌনকেশোদ্গমের অভাব, স্তন ও যৌনাংগগুলির শৈশবদশায় পড়ে থাকা, শিশ্ন ও শুক্রাশয়ের অপরিণতি ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ।

(খ) ফরবেস সিণ্ড্রোম (Forbes Syndrome)—সম্ভবত পিটুইটারী গ্রন্থিতে 'আব' জন্মানোর ফলে এ রোগ হয়। গর্ভাধান না হওয়া সত্ত্বেও অরজস্বলতা ও দুগ্ধোৎপাদন এ রোগের চমকপ্রদ লক্ষণ।

(৩) **এড্রিনাল গ্রন্থির গণ্ডগোল ঃ**

এড্রিনো-জেনিটাল সিণ্ড্রোম বা পুংরসঘটিত টিউমার—এ রোগে ভগাংকুর বর্ধিতাকার প্রাপ্ত হয়, এবং রজোস্রাব অত্যল্প বা বন্ধ

হয়ে যায়। অবশ্য যৌনোদ্গমের পরে এ রোগ শুরু হলে রজোস্রাব পুরোপুরি বন্ধ নাও হতে পারে। তাছাড়া স্তন ও জরায়ু শৈশবাবস্থায় থাকে ও পুরুষালি ভাবাপন্ন হয় এই রোগের রোগিনীরা।

(৪) **থাইরয়েডের গণ্ডগোল:**

থাইরয়েডের অন্তঃরসের সংগে ডিম্বাশয়ের সম্পর্ক নিহিত আছে। এই গ্রন্থির অতিক্রিয়ার ফলে রজোস্রাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার বয়ঃসন্ধিকালে রজোস্রাবের আধিক্যের চিকিৎসা হিসাবে থাইরয়েডের অন্তঃরস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৫) **যৌনগ্রন্থির গণ্ডগোল:**

(ক) **শুক্রাশয়** থেকে পুংরস ক্ষরণের আধিক্য বা স্বল্পতা হেতু শিশ্ন, মুষ্কথলি, প্রোষ্টেট, শুক্রথলি প্রভৃতি অংগের অতিবৃদ্ধি বা অপরিণতি ঘটতে পারে। ফলত পৌরুষের বহির্লক্ষণের অভিব্যক্তির ইতর বিশেষ হতে পারে।

(খ) **ডিম্বাশয়** থেকে এষ্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টেরোন অন্তঃরসদুটির অযথার্থ উৎপাদনের ফলে স্ত্রীজননাংগের ও স্ত্রীলক্ষণের গোলমাল হতে পারে।

জননবৈকল্যে ক্রোমোজোমের প্রভাব

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থেকে বয়ঃসন্ধিকালে ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকত্ব সন্দেহ করা যেতে পারে—

(১) বয়ঃসন্ধির শেষভাগ পর্যন্ত কোন দৃশ্য কারণ ছাড়াই ঋতুমতী না হওয়া।

(২) কোনো জ্ঞাত কারণ ছাড়াই শুক্রাণুর অভাব।

(৩) বহির্জননাংগের অসাধারণত্ব, যথা, দীর্ঘকায় শিশ্ন বা ভগাংকুর, ভগপত্রের আংশিক জোড়া লেগে থাকা, ক্ষুদ্রাকৃতি শিশ্ন ও অণ্ডকোষ ইত্যাদি।

(৪) পুনঃসংঘটনশীল গর্ভপাত বা মৃতবৎসতা।

(৫) জন্মগত অস্বাভাবিক গঠন ও মানসিক বৈকল্য।

প্রাণীদেহের শুরু হয় নিষিক্ত ডিম্বাণু বা বীজকোষ (zygote) থেকে এবং তার গঠন কি কায়দায় হবে তার 'ব্লু-প্রিণ্ট' নিহিত থাকে ঐ বীজকোষের কোষ-

কেন্দ্রস্থ ক্রোমোজোমের ডি. এন. এ. (D N A) অনুসমূহের মধ্যে। মনুষ্য জীবকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৩ জোড়া। তার মধ্যে ২২ জোড়াকে বলে অটোজোম (autosome)—তারা দৈহিক গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। আর একজোড়া হল যৌন-ক্রোমোজোম (sex chromosome)—এরা দৈর্ঘ্য অনুযায়ী XX অথবা XY রূপে অবস্থান করে এবং যৌন ও দৈহিক চরিত্র নির্ধারণ করে। স্ত্রীলোকে ছুটো যৌন-ক্রোমোজোম একই দৈর্ঘ্যের হয় ও তাদের চিহ্নিত করা হয় X-X হিসাবে। আর পুরুষের যৌন-ক্রোমোজোম ছুটির দৈর্ঘ্য আলাদা হয়ে থাকে ও তারা চিহ্নিত হয় X-Y হিসাবে। এই সব ক্রোমোজোমের মধ্যে কতগুলি ডি. এন. এ-অণু বংশগতি রক্ষা করে, তাদের বলা হয় জিন (gene)। এই সব জিনের পারস্পরিক বিক্রিয়া ও সংযোগে পুরুষানুক্রমিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে ও নবতর বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।

যদিও বীজকোষে যৌন-ক্রোমোজোমের গঠনবিন্যাসই জাতকের লিংগ নির্ধারণে সক্ষম, তবু এই বীজকোষের পরবর্তী পরিণতি স্তরে চূড়ান্ত বিভাজন কালে যৌন-ক্রোমোজোমগুলির অপবিতরণ হতে পারে। ফলে, কোন দেহকোষে ছুটো, কোনটাতে বা একটা, আবার কোনটাতে হয়তো ছুয়ের বেশী যৌন-ক্রোমোজোম অবস্থান করতে পারে। এই ভাবে যৌন-ক্রোমোজোমের অপ-অবস্থানের কারণে বিভিন্ন ধরণের ক্রোমোজোমবৈষম্যজনিত দৈহিক ও মানসিক রোগ দেখা যায়।

পুরুষের ক্ষেত্রে X-ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা সাধারণত XXY বা XYY রূপে দেখা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে (যার ডাক্তারী নাম Klinefelter's syndrome) থাকে বাইশ জোড়া অটোজোম, ছুটো X ক্রোমোজোম, এবং একটা Y ক্রোমোজোম—মোট ৪৭টি ক্রোমোজোম (স্বাভাবিক ২৩ জোড়া বা ৪৬টির পরিবর্তে)। অতিরিক্ত স্ত্রী-যৌন-ক্রোমোজোম X-এর অবস্থানের ফলে এই রোগে দৈহিক সংগঠনে স্ত্রীবৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য পায়, যেমন পুরুষের স্তনবৃদ্ধি, কেশবিন্যাস স্ত্রীধরণের, ছোট অণ্ডকোষ প্রভৃতি। বেশ বেশী বয়স পর্যন্তই এই অবস্থা অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে। এই ধরণের ক্রোমোজোমবিকৃতি আরো বর্ধিত আকারে অর্থাৎ ৪৮, XXXY বা ৪৯ XXXXY সংগঠনে ঘটতে পারে। এই সব অবস্থায় অস্থিসংগঠনে বিকৃতি বা মানসিক জড়তা দেখা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যখন মোট ৪৭টি ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি X

ক্রোমোজোম ও দুটি Y ক্রোমোজোম থাকে, তখন পুরুষ-চরিত্র প্রাধান্য পায়। এই সব রোগীরা অস্বাভাবিক লম্বা, অল্পবুদ্ধি ও সমাজবিরোধী-প্রবণতা-সম্পন্ন হয়। এই অস্বাভাবিকতাও বয়ঃসন্ধিকালের আগে ধরা যায় না। মূত্রনালীমুখ শিশ্নের নিম্নভাগে অবস্থিত হলে (hypospadias) অথবা অণ্ডকোষের অবস্থান মুষ্কথলিতে না হলে (cryporchidism) এই অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে।

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে X ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা হতে পারে ৪৫XO, ৪৭ XXX অথবা ৪৬ XY ক্রোমোজোম সংগঠনের রকমফেরে। এদের মধ্যে প্রথমটিতে (Turner-Ulrich syndrome) দেহগত বিকৃতি, যৌন অপরিপক্কতা বা অরজস্বলতা ঘটে। দ্বিতীয় রোগে (Triple-X female) কিন্তু অধিকাংশ কিশোরীই দেহগঠনে ও যৌনবিকাশে স্বাভাবিকত্ব প্রকাশ করে থাকে। তৃতীয় অস্বাভাবিকতায় (Tetsticular feminization) একটি X-এর বদলে Y-এর আগমনের ফলে বহিরংগে স্ত্রীলক্ষণাক্রান্ত হলেও যৌনগ্রন্থি আসলে থাকে পুরুষের শুক্রাশয়। ফলত স্তনের অপরিপূর্ণতা ও প্রাথমিক অরজস্বলতা (primary amenorrhoea) দেখা যায়। স্ত্রীযোনীর বহিরংগের গঠন যথাযথ থাকলেও জরায়ু ও ভগনালী অনুপস্থিত থাকে। যৌনগ্রন্থিগত-ভাবে পুরুষ হলেও এরা স্ত্রীলোকের মত আচরণ করে এবং সমাজেও স্ত্রীলোক হিসাবে বিবেচিত হয়। এই অবস্থা এক ধরণের উভলিংগত্ব।

উভলিংগত্ব (hermaphroditism) অর্থে বোঝায় বহিরাকৃতিতে প্রকট লিংগ আসলে যৌনগ্রন্থিগত লিংগের উল্টো। তাই কোন একজনের স্ত্রী-পুরুষত্ব শুধুমাত্র একটা দুটো লক্ষণ দিয়ে স্থির করা অবৈজ্ঞানিক। ব্যক্তির নিজের কাছে, এবং সমাজের কাছেও, স্ত্রী-পুরুষত্বের পরিচয় সাধারণত বহিরংগের যৌনচরিত্রের, বিশেষ করে জননাংগ, স্তন, কেশোদগম, স্বরবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি, গৌণ যৌনবৈশিষ্ট্যের, জোরে। কিন্তু এই বহিরংগের পরিচয়ের অন্তরালে তার যৌনগ্রন্থি আসলে বিপরীত প্রকৃতির হতে পারে এবং সেইসব ক্ষেত্রকে বলা হয় উভলিংগত্ব। যে ক্ষেত্রে যৌনগ্রন্থি থাকে পুং-শুক্রাশয় অথচ বহিরংগের প্রকৃতি স্ত্রীবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, তাকে বলা হয় পুং-উভলিংগত্ব (male hermaphroditism), যেমন পূর্বোল্লিখিত ৪৬ XY অস্বাভাবিকতায় দেখা যায়। আর, যেক্ষেত্রে যৌনগ্রন্থি স্ত্রী-ডিম্বাশয় অথচ বহিরংগে পুরুষপরিচিতি প্রকট, তাকে বলা হয় স্ত্রী-উভলিংগত্ব (female hermaphroditism), যেমন ৪৭XXY

অস্বাভাবিকত্বে মেলে। এই অবস্থায় ভগাংকুর দীর্ঘাকৃতি ধারণ করে অনেকটা শিশ্নের মত দেখতে হয়।

জিনজনিত সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ (Genetic Counselling)

চিকিৎসক, জিনবিজ্ঞানী ও সমাজসেবীরা প্রায়শই জিনজনিত সমস্যা সম্পর্কে এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হ'ন—

(১) রোগ পুরুষানুক্রমে অন্বয়াগত কিনা?

(২) ভবিষ্যতে এই রোগের পরিণাম কি হতে পারে?

(৩) রোগীর জীবনে এই রোগ কি প্রভাব ফেলতে পারে?

(৪) এই ধরণের রোগীদের বিবাহ করা সংগত কিনা?

(৫) এই রোগ পরবর্তী প্রজন্মে অনুক্রমিত হতে পারে কিনা?

এইসব প্রশ্নের উত্তরসম্বলিত উপদেশ যাকে দিতে হবে, তার বয়স, জাতি, ধর্ম, শিক্ষান্তর ও নৈতিক ধারা অনুসরণ করে তা দিতে হবে। যেহেতু বয়ঃসন্ধির তরুণ-তরুণী ভাবীকালের পিতামাতা, তারা সেহেতু নিজে না রোগভোগ করেও পরবর্তী প্রজন্মে জিনঘটিত অস্বাভাবিকতা বাহিত করতে পারে। কোন কিশোর বা কিশোরী প্রচ্ছন্ন (recessive) জিনের অধিকারী হওয়ার কারণে নিজে নীরোগ হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে, কিন্তু একই রোগের দুই নীরোগ বাহকের সম্মিলনে রোগসম্পন্ন শিশুর জন্ম সম্ভব। তাছাড়া অনেক রোগের বাহক জিন শুধুমাত্র যৌন-ক্রোমোজোমের মধ্যে নিহিত থাকে। সেক্ষেত্রে বাহকমাতা শুধুমাত্র পুত্রসন্তানে রোগ বাহিত করে, নিজে না ভুগে বা কন্যাসন্তানে অনুক্রমিত না ক'রে।

জিনজনিত সমস্যায় পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ খুবই জরুরী এবং সহায়ক। তাছাড়া ডাক্তারী পরীক্ষায় মুখের ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী চেঁছে নিয়ে তাতে 'বার-বডি' (X-ক্রোমোজোম) বা প্রতিপ্রভ Y-বডি দেখা, অথবা ক্রোমোজোম-বিশ্লেষণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে জিন-বৈকল্যের নির্ণয় বা এই বৈকল্যের বাহক নির্ণয় খুবই সম্ভব। জিন-বৈকল্যের বিভিন্ন রকমফেরের প্রকট (dominat) ও প্রচ্ছন্ন (recessive) জিন অনুযায়ী তালিকা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে[৮৩]। জিনবৈকল্য সম্পর্কে উপদেশে এই তালিকা বিশেষ সহায়ক হতে পারে। বর্তমান আলোচনায় আর বিশেষ বলা বাহুল্য মাত্র।

১২

বয়ঃসন্ধিকালে গৌণ যৌনবৈশিষ্ট্যের অস্বাভাবিকতা

যৌনোদ্গমের অনুষংগ হিসাবে গৌণ যৌনবৈশিষ্ট্যগুলি বয়ঃসন্ধির বিভিন্নস্তরে একে একে আবির্ভূত হয়, এবং কিছুটা ইতরবিশেষ থাকলেও এক এক বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবকাল মোটামুটি নির্দিষ্ট। সুতরাং এই সব আনুষংগিক যৌনচরিত্রগুলির আবির্ভাব যথাকালের পূর্বে বা পরে ঘটলে তরুণ-তরুণী ও তাদের অভিভাবকদের মনে অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হ'তে পারে। তাই এ বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

(১) অকাল যৌনোদ্গম :

ব্যাপারটা খুবই চমকপ্রদ হলেও বোঝা খুবই দুষ্কর। বালিকাদের ক্ষেত্রেই বেশী ঘটে, অন্ততঃ নজরে বেশী আসে। এই অবস্থায় বালিকাদের আট বছর বয়সের আগেই গৌণ যৌনচরিত্রগুলি হাজির হয়ে যায়, এমনকি ঋতুস্রাবও শুরু হয়ে যেতে পারে। বালকদের ক্ষেত্রে ন'বছর বয়সের আগেই ঐসব যৌন-লক্ষণগুলি দেখা যায়[৮৪]। যৌনতার এই অকালপক্কতার মূল কারণ যৌনরসের অধিক উৎপাদন। এই অধিক উৎপাদন যৌনগ্রন্থির অতিক্রিয়া ছাড়াও পিটুইটারী-নিঃসৃত গোনাডোট্রপিনের আধিক্য অথবা এড্রিনালের যৌনরস-উৎপাদক কোষগুলির অতিবৃদ্ধির কারণে ঘটতে পারে। অনেকসময় যৌন-রসসমন্বিত ক্রীম ব্যবহারের ফলেও এ দুর্ঘট ঘটতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অকালপক্ক কিশোরীর যৌন-উদ্দীপনা থাকে না[৮৫], কিন্তু অকালপক্ক কিশোরের যৌন-প্রবণতা ও উত্তেজনা দেখা যায়[৮৬]।

(২) বিলম্বিত যৌনোদ্গম :

অকাল যৌনোদ্গম যেমন অকালে যৌনরসের অতিক্ষরণের কারণে ঘটে থাকে, তেমনি এই রসের যথাকালে যথেষ্টক্ষরণের অভাব ঘটলে যৌনোদ্গম বিলম্বিত হতে পারে। কিশোরীদের চৌদ্দ বছর বয়সে গৌণ যৌনচরিত্রের আবির্ভাব না ঘটলে যৌনোদ্গম বিলম্বিত বলে ধরা যায়[৮৭]। পিটুইটারী ও যৌনগ্রন্থির অস্বাভাবিকতা এই বিলম্বের মূল কারণ। তাছাড়া ক্রোমোজোমের

গণ্ডগোলেও, যেমন Klinefelter's syndrome বা Turner's syndrome ইত্যাদি রোগে, যৌনোদ্গম বিলম্বিত হতে দেখা যায়।

(৩) **স্তনবিকাশের অস্বাভাবিকতা :**

কিশোরের স্তনস্ফীতি (gynecomastia) মোটামুটি সাময়িক। বয়ঃসন্ধিকালের আরম্ভভাগে স্ত্রীযৌনরসের খানিকটা প্রাবল্য থাকে পুরুষের মধ্যেও এবং তার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের স্তনবৃদ্ধি ঘটতে পারে। ফলে স্তনবৃন্তের নীচে বেদনাদায়ক কঠিন স্ফীতি ঘটে, অধিকাংশক্ষেত্রে একদিকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না, স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী-অন্তঃরস কমে যাওয়ার ফলে আপনা আপনিই দু'তিন বছরের মধ্যে এই স্তনস্ফীতি হ্রাস পায়। তবে এই সময়ে কিশোরটি লোকজনের সামনে আদুড়-গা হতে লজ্জা পায় এবং খানিকটা মানসিক অস্বস্তি ভোগ করে। ক্বচিৎ এই অবস্থার প্রতিবিধানকল্পে শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কিশোরীদের ক্ষেত্রে অকাল স্তনবৃদ্ধি (premature thelarche) সাধারণতঃ অকালযৌনোদ্গমের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকে। অবশ্য অকালযৌনোদ্গম ছাড়াও এই অবস্থা ঘটতে পারে। মূলত এর পিছনে থাকে এস্ট্রোজেনের প্রতি দুগ্ধগ্রন্থিকলার অতি-সংবেদনশীলতা। আবার স্তনের অল্পবৃদ্ধিও উঠতি বয়সের মেয়েদের কাছে আর এক সমস্যা। যথাযথ আয়তনের চেয়ে ছোট বা সমতল ধরনের স্তনবিকাশ অনেকক্ষেত্রেই কিশোরীদেয় মধ্যে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে সে যদি তার সমবয়সীদের পূর্ণায়তবক্ষা হিসাবে দেখতে পায়। এসব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে ফলসি বা প্যাড ব্যবহার শুরু হয়েছে, হয়তো এদেশে ব্যবহার হতেও দেরী হবে না। কিশোরীদের স্তনবিকাশের আর এক সমস্যা হ'ল অসমবৃদ্ধি (asymmetry)। যদিও স্তন হ'ল যুগ্মযন্ত্র, খুব কদাচিত তারা সমহারে বর্ধিত হয়। এই স্বাভাবিক অসাম্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে দুশ্চিন্তা অনেকটাই কাটানো যায়। স্তনের অতিবৃদ্ধিও কোনো কোনো কিশোরীর জীবনে ঘটে। বিশেষ করে সে যদি একটু বেশী মোটাসোটা হয়। এই অতিবৃদ্ধি বেশী চর্বি জমার ফলে অথবা দুগ্ধগ্রন্থিকলার অতিবৃদ্ধির ফলে ঘটতে পারে। যদি এই অতিবৃদ্ধি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে, বিশেষ ধরনের বক্ষোবন্ধনীর দ্বারা তার উপশম ঘটানো যেতে পারে। চরমক্ষেত্রে সৌন্দর্যবিধায়ক অস্ত্রোপচারের বিধানও মেলে।

স্তনের আকার-আয়তন স্তনগ্রন্থিকলার পরিমাণ ও চর্বির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। গ্রন্থিকলার বিকাশের সর্বোত্তম নির্দেশক হ'ল স্তনবৃন্তের অবস্থা। পরিপূর্ণ স্তনগঠনের জন্য দায়ী পরিবারগত উত্তরাধিকার অথবা খাদ্যপুষ্টি। তাছাড়া যৌনরসের প্রভাবও আছে। অবশ্য যৌনরসের অভাবে স্তনবিকাশের গণ্ডগোল হলে অন্যান্য সহযোগী যৌনবৈশিষ্ট্যেরও গোলমাল দেখা যাবে।

(৪) যৌনকেশোদগমের অস্বাভাবিকতা :

অকালে সকালে অর্থাৎ পাঁচ থেকে নয় বছরে শুধুমাত্র বস্তিকোশোদ্গম হতে দেখা গেছে। বালকদের চেয়ে বালিকাদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা বেশী ঘটে এবং কেশোদ্গম শুধুমাত্র তলপেটেই সীমাবদ্ধ থাকে। সম্ভবত এর পেছনে কারণ হ'ল এড্রিনাল গ্রন্থি থেকে যৌনরসের অধিক উৎপাদন। তাছাড়া যৌন-কেশোদ্গমের অল্পতা বা আধিক্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর বা কিশোরীর একেবারেই চুল গজালো না বা অল্প পরিমাণে গজালো এমন অবস্থা ঘটতে পারে পিটুইটারীর দোষজনিত শৈশবত্ব (pituitary infantilism), অণ্ডকোষের অনবতরণ (cryptorchidism) অথবা ডিম্বাশয়ের অপরিণতি (Turner syndrome) ইত্যাদি রোগের ফলে। তেমনি অতি-লোমশতা (hirsutism) রোগে গোঁফদাড়ি, বুকে ও বস্তিপ্রদেশে কেশোদ্গমের আধিক্য ঘটে। এই কেশাধিক্যের সংগে অতিপৌরুষ (virilization) বর্তমান থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। অতিলোমশতা তাকেই বলা যাবে যখন উদ্গত কেশ অস্বাভাবিক কর্কশ, দীর্ঘতর ও পরিমাণে বেশী হবে। এই লোমশতা বয়স, লিংগ ও জাতিবৈশিষ্ট্যের কেশপ্রকৃতির সংগে কোনো সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। অতিলোমশতার প্রধান কারণ জাতিগত ও পরিবার-গত বৈশিষ্ট্য, যৌনগ্রন্থি ও এড্রিনাল গ্রন্থির রোগজনিত পুং-যৌনরসের আধিক্য অথবা অযথা দীর্ঘদিন ধরে কোন পুংরস দ্বারা চিকিৎসা।

(৫) রজোপ্রবৃত্তির অস্বাভাবিকতা :

যৌনবৈশিষ্ট্যের গৌণ অস্বাভাবিকতাগুলির মধ্যে ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার গণ্ডগোলই সম্ভবত সর্বাধিক। আগেই বলা হয়েছে, বয়ঃসন্ধিকালীন যৌনোদ্গমের শুরুতে হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারী-ডিম্বাশয় অক্ষের স্বাভাবিক

কার্যকলাপ স্থাপিত হতে বেশ কিছুদিন লাগে। এবং এও এখন জানা কথা যে মাসিক-স্রাবের অন্তরালে থাকে ডিম্বাশয়-নিঃসৃত এষ্ট্রোজেন-প্রজেষ্টেরোন দ্বারা প্রভাবিত জরায়ুর অন্তর্কলার বিকাশ। এই বিকাশ ও অন্তঃরস-ক্ষরণ এক চক্রাবর্তে সংঘটিত হয় এবং এই চক্রের কালক্রম সংস্থিত হতে স্বাভাবিকভাবেই বেশ বিলম্ব হয়। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য যৌন-চরিত্রের আবির্ভাব সত্ত্বেও প্রথম রজোদর্শন বিলম্বিত হওয়া অসম্ভব নয়। তেমনি অসম্ভব নয় প্রথম ঋতুস্রাবের পরে দীর্ঘদিন বাদ বাদ ঋতুস্রাবের ঘটনাও। মাসিক বা আটাশ দিনের নিয়মিত ব্যবধান বয়ঃসন্ধির প্রথমদিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে না। মায়েরা তাদের পুরানো দিনের কথা ভুলে যান বলেই সম্ভবত তাঁদের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক বিলম্বে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং অনেকক্ষেত্রে চিকিৎসকের শরণাপন্নও হ'ন।

১৩

বয়ঃসন্ধিকালে যৌনমানসিকতার সমস্যা

আধুনিক সমাজে টিন-এজারদের সামনে যৌন-উত্তেজনাকর সামগ্রী উন্মুক্ত থাকে। সিনেমা, রেডিও, টিভি, পোষ্টার, ব্যানার ইত্যাদি জনসংযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যেই যৌন-উত্তেজনাকর ছবি ও বাণীর প্রচার হয়ে থাকে। তাছাড়া গোপনে নিষিদ্ধ যৌন-সাহিত্য আমদানীরও তেমন কঠিন বাধা নেই তরুণ-সমাজের কাছে। কৈশোরে যৌনতার ধারণা গঠনশীল পর্যায়ে থাকে এবং তাদের আশা-আকাংখা ও অনুভূতি তাই যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।

এখনো পর্যন্ত চলতি রীতি অনুসারে বা অজ্ঞতাবশত যৌনতার ধারণা শুধুমাত্র জননতন্ত্রকে কেন্দ্র করেই সীমায়িত। কিন্তু যৌনতা তো কেবল ঐ জননতন্ত্রেই শেষ নয়, মানুষটা স্ত্রী বা পুরুষ হিসাবে যা কিছু কাজ করছে বা চিন্তা করছে সবটা বেষ্টন করেই তার যৌনতা। জন্ম থেকেই স্ত্রী-পুরুষে জনন-তন্ত্রের ভেদ থাকলেও তাই মনুষ্য জীবনের দ্বিতীয় দশকেই শিশু নিজেকে কিশোর বা কিশোরীতে রূপান্তরিত করে তার দৈহিক পরিবর্তনের সংগে সংগে তার মানসিকতায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই বিকাশের স্তরে বড় হওয়া ও বড়দের সুযোগ-সুবিধা অর্জন করা এবং সেই সংগে শৈশবকালে পাওয়া সুবিধাগুলি ভোগ করার মানসিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এই বয়ঃ-সন্ধিকালে। আর এই দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে তার লিংগভেদের মানসিকতা ও সেই সংগে যৌনতার সমস্যাগুলিও।

পাশ্চাত্যে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন বয়ঃক্রমে পরস্পর সংসর্গে হাত ধরাধরি, চুম্বন ইত্যাদি থেকে প্রকৃত যৌনসংগম পর্যন্ত আটটি পর্যায়ের যৌন-আচরণের বিবরণ পাওয়া যায়[৮৮]। কিন্তু প্রাচ্যে সামাজিক গঠন ও জীবন-ধারণ প্রণালী পাশ্চাত্যের থেকে ভিন্ন। তাই এখানে যৌন-আচরণ ভিন্ন ধরনের হওয়াই সম্ভব। তবে উঠতি বয়সের বিভ্রমে যে সব স্বাভাবিক বিকৃতি কৈশোরের যৌনাচরণে আসা সম্ভব, সেগুলি আলাদা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বয়ঃসন্ধিকালের সেই সব বিশেষ যৌনসমস্যাগুলি হল মোটামুটিভাবে স্বমেহন, সমকামিতা ও যথেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি। এইগুলি সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক।

(১) স্বমেহন (Masturbation, Auto-eroticism) :

বয়ঃসন্ধির প্রথম ও মধ্যভাগে স্বমেহন বা হস্তমৈথুনই রতিসুখ পাওয়ার সব থেকে বেশী প্রচলিত প্রথা। এই স্বমেহনের সুফল বা কুফল সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও কোনো সঠিক ধারণা এখনো পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নয়। কৈশোরের এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে বয়স বাড়ার সংগে সংগে। বিপরীত লিংগের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'লে অথবা শারীরিক বা মানসিক স্বস্তির অন্য উপায় পেয়ে গেলে যৌনপরিতৃপ্তির এই সহজ উপায় সম্পর্কে অধিকাংশেরই অনীহা জন্মে যায়। এ ব্যাপারে সব থেকে বিপদের কথা হল অপরাধবোধ—চলতি ধারণা বা উপযুক্ত যৌনজ্ঞানের অভাবে স্বমেহন-প্রয়াসী কিশোর বা কিশোরী জানেই না যে স্বমেহন কোন রকম যৌন-বিকৃতি নয়, ক্ষতিহীন স্বাভাবিক শারীরক্রিয়া মাত্র ও সুস্থ যৌনচেতনার ফল। তাই সে এই প্রক্রিয়ায় ব্রতী হ'লে নিজেকে অপরাধী ভাবে, বিশেষ করে গুরুজনরা বা বন্ধু-বান্ধবরা যদি সদুপদেশ দিতে থাকে। স্বমেহন তখনই যৌনবিকৃতি বলে ধরা হবে, যখন কেউ স্বাভাবিক যৌন-সংসর্গের চেয়ে এই প্রক্রিয়াকে বেশী তৃপ্তিকর বলে বোধ করবে।

(২) সমকামিতা (Homosexuality) :

কিশোরদের মধ্যে sodomy বা কিশোরীদের মধ্যে crushes-এর কথা শোনা যায়। গভীর স্তরের সমকামিতাও কালক্রমে বয়ঃসন্ধির শেষ ভাগে স্তিমিত হয়ে আসে। যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের আলাদাভাবে বাস করার ব্যবস্থা বা যেসব অবস্থায় বিপরীত লিংগের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের বাধা প্রবল, সে-সব ক্ষেত্রেই সমকামিতার প্রাবল্য ঘটে। তবে এ ধরনের যৌন-মানসিকতা খুবই অস্থায়ী। মা-বাবার উপর অতিনির্ভরতা বা বিতৃষ্ণা, স্বাভাবিক সংগমকালে যন্ত্রণাবোধ, অথবা বিকৃত অবিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি কারণে আবেগবিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সমকামিতাকে দেখা হয়। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানীর মতে পুরুষ সমকামীরা আসলে স্ত্রী-মনোভাবাপন্ন।

(৩) যৌনযথেচ্ছাচার (Promiscuity) :

যুদ্ধোত্তরকালে উন্নত দেশগুলিতে 'যৌন-বিপ্লব' ঘটে গেছে—বিশেষ করে অবিবাহিত যৌনসম্পর্কের প্রচলনের মাধ্যমে। আমেরিকার পনের থেকে উনিশ

বছরের কিশোরীদের যৌনকর্মের অভ্যুত্থানের খবর পাওয়া যায়[৮৯]। ভারতীয় কিশোর-কিশোরীদের এবিষয়ে কোনো ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায় না বটে, তবে অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণায় জানা যায় যে এদেশেও কৈশোরে অবিবাহিত যৌন-সংগম বাড়তির মুখে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। কেননা, কৈশোর বয়ঃক্রমে যৌনজরোগ ও বিবাহ ব্যতীত গর্ভাধানের সংখ্যা বেড়ে চলতে দেখা যাচ্ছে। ভারতে অবশ্য এখনো প্রচলিত রীতি-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক কারণে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিশেষভাবে প্রসার ঘটেনি। উপরন্তু গ্রাম্যসমাজে অল্পবয়সে বিবাহের প্রথা চালু থাকায় বাধাবন্ধহীন যৌনসম্ভোগের ততটা প্রসার ঘটতে পারেনি। তবে 'আস্কারা সমাজের' (permissive society)[৭৬] প্রসার দিন দিন যেমন বাড়ছে, বাছবিছারবিহীন যৌন-সম্ভোগের সম্ভাবনাও তেমনি বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই।

(৪) যৌনজরোগ (Venereal diseases) :

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই যৌনজরোগের প্রসার দিন কে দিন সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। এই ধরনের রোগের ঝুঁকি বয়ঃসন্ধিকালেই বেশী। কারণ তারুণ্যের আবেগপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা তার অর্ধপরিণত মানসিকতাকে প্রায়ই অতিক্রম করে, ফলত বারেকের যৌন-অভিজ্ঞতার পরিতৃপ্তি তাকে বহুজনের সংগে যৌনসম্পর্কের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাছাড়া অভিজ্ঞতার অভাবে রোগাক্রান্ত হলেও বুঝতে না পারার দরুণ উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে তার দেরী হয়ে যায়। এক সমীক্ষায়[৯০] দেখা যাচ্ছে গণোরিয়া রোগীদের প্রতি চারজনের একজন দশ থেকে উনিশ বছরের কিশোর বা কিশোরী। অবশ্য পুরুষদেরই যৌনজরোগে বেশী ভুগতে দেখা যায়, কেননা স্ত্রীলোকদের এই ধরনের রোগের লক্ষণ অনেকটাই অপ্রকাশিত থেকে যেতে পারে।

যৌন-সাহিত্য বা যৌন-উত্তেজনাকর চলচ্চিত্রের প্রভাবে অপরিণত তরুণ-তরুণীরা মোহগ্রস্ত হয় এবং সহজলভ্য সস্তা উৎস থেকে যৌন আনন্দ পাওয়ার প্রয়াস পায়। সাম্প্রতিককালে তরুণসমাজে যে যৌন-অভ্যুত্থান ঘটেছে, বিশেষ করে বাছবিচারহীন যৌনসম্ভোগের প্রবণতা যেরকম বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে যে যৌনরোগের প্রসার ঘটবে এতে আর আশ্চর্য কি। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে টিন-এজাররা কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বনের চিন্তা পর্যন্ত করে না ; তাছাড়া

আবেগের বশে হঠাৎ ঘটে যাওয়া যৌন-সংযোগের সময় সতর্কতার সুযোগও মেলে না, ফলে সহজেই তারা এই সব রোগের শিকার হয়ে পড়ে।

ভারতে যৌনজরোগ সম্পর্কে সমীক্ষা কম। তবু যেসব হিসাব মেলে তাতে দেখা যায় যৌনরোগের ঘটনা বাড়তির মুখে[৯১]। মহারাষ্ট্রের পুনাতে ছাত্রদের মধ্যে এক সমীক্ষায়[৯২] দেখা যাচ্ছে যে পনের বছরের নীচে ৪ শতাংশ ও ষোল থেকে কুড়ি বছরের ৫৪% শতাংশ ছাত্র যৌনরোগী। আর, রোগাক্রান্ত ছাত্রীদের মধ্যে ১১ শতাংশ হল পনের বছরের নীচে এবং অধিকাংশভাগ হল ষোল থেকে কুড়ি বছরের বয়ঃক্রমে।

বন্ধনবিহীন সমাজে যখন যৌনযথেচ্ছাচারের প্রবণতা কমানো খুবই দুষ্কর, তখন সুচিকিৎসা ছাড়াও রোগের উৎস খুঁজে বার করে পুনঃ-সংক্রমণ ও বিস্তার নিবারণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া দরকার। যৌনরোগের প্রতিকার ও নিবারণ সম্পর্কে উপযুক্ত যৌনশিক্ষাও তাই বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ জরুরী।

১৪
বয়ঃসন্ধির আধিব্যাধি

বয়ঃপ্রাপ্তদের যে-সব ব্যাধিবিকারের প্রকোপ হয়, বয়ঃসন্ধিকালেও সে-সবের অধিকাংশের প্রকোপ হওয়া সম্ভব। তবে কতকগুলি রোগ বা দেহবৈকল্য এই বয়সে বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে, তাই সেগুলি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

রোগাক্রান্ত কিশোর-কিশোরী শুধুমাত্র রোগজনিত সমস্যাই সৃষ্টি করে না, অসুস্থতা তার ঘরোয়া জীবন, স্কুলের কাজ, খেলাধূলাদি শারীরিক ক্রিয়াকাণ্ড ও সংগীসাথীদের সংগে সম্পর্ক সবকিছুকেই বিড়ম্বিত করে তুলে গভীরতর সমস্যার সৃষ্টি করে। উন্নয়নশীল দেশে তার ওপর আরো সমস্যা হ'ল দারিদ্র্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রাচুর্য। আর মজা এই যে, আর্থিক দৈন্যসম্পন্ন সমাজের ছেলেমেয়েরাই বেশী করে রোগ ভোগ করে থাকে। বিশেষ করে, এই সব অস্বচ্ছল পরিবারের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যক্ষ্মা, দৃষ্টি-দৌর্বল্য, দন্তক্ষয় প্রভৃতির বেশ প্রাবল্য দেখা যায়।

বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা অবোধ শিশু নয়, সুতরাং তাদের কাছে আশা করা যেতে পারে যে তাদের রোগের কষ্ট ও লক্ষণ ভালভাবেই গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সময় সময় তারা এতই দায়িত্বহীনভাবে চাপাপ্রকৃতির হয়ে যায় যে তাদের ব্যবহার শিশুসুলভ হয়ে পড়ে। সে কারণে এই বয়সের রোগী বা রোগিনীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিদকে ব্যক্তিগত মনোযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের সংগে এদের গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে বয়ঃসন্ধির বালক-বালিকা যেন অনুভব করে যে তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই বয়সের নিজস্ব এক দৈহিক-মানসিক দাবী থাকে। তাই শিশুবিশেষজ্ঞর মত বয়ঃসন্ধিবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগোষ্ঠী গড়ে তোলাই হবে আদর্শস্থানীয়। প্রায় প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীই তার গোপনীয়তা সম্পর্কে অল্পবিস্তর স্পর্শকাতর ও সচেতন। সেকারণে বয়স্কদের সংগে একত্রে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে তাদের লাজুক স্বভাববশে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেই। হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিভাগেও কিশোরী রোগিণীদের এই অস্বস্তিবোধ ও অপ্রতিভতা এক বিশেষ সমস্যা।

বয়ঃসন্ধিকালে বাড় হয় দু'দিকে—দৈহিক হাড়ে-মাসে আর যৌন-জননতন্ত্রে। এই বাড়ের ক্ষেত্রে যেসব অস্বাভাবিকতা এসে পড়ে, তা এক একটা ব্যাধির আকার ধারণ করলেও, আলাদা সমস্যা। তাই ঐ বৃদ্ধি-বৈকল্য, জনন-বৈকল্য আর মানসিক বৈকল্যের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এবারে আসা যাক, চিকিৎসার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দরবারে বয়ঃসন্ধির বয়ঃক্রমে যেসব রোগী হাজির হয় তাদের ব্যাধিগুলি সম্পর্কে আলোচনায় এক এক করে।

মৃগী ঃ যদিও শৈশবেই এই রোগের শুরু, তবে যৌনোদ্গমের সময়ে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি ঘটে থাকে। লঘুধরণের মৃগী (petitmal) অবশ্য যৌনোদ্গমের পরে তিরোহিত হয়ে যায়। বিশেষ করে, কিশোরীদের ঋতুকালের ঠিক আগে মৃগীর খিঁচুনি প্রায়শই বেড়ে যায় ; কতকধরণের মৃগীর সংগে তাই হিষ্টিরিয়ার লক্ষণের তফাৎ করা শক্ত হয়ে পড়ে।

মৃগীর খিঁচুনি ঔষধ প্রয়োগে আয়ত্তে এলে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কিশোর-কিশোরী নিয়মিত পড়াশোনা চালাতে পারে, এমন কি সামাজিক ক্রিয়াকর্মেও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। শারীরিক প্রশিক্ষণ নিতেও কোনো বাধা নেই। বরং শারীরক্রিয়া মৃগীরোগীদের পক্ষে উপকারী। তবে কতকগুলি ভারী ব্যায়াম বা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ নিরাপত্তার খাতিরে এড়ানো উচিত।

রক্তাল্পতা ঃ ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে রক্তাল্পতার ঘটনা এত প্রচুর যে হিমোগ্লোবিনের নিম্নমান এদেশে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। এগার থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলেমেয়েদেরই রক্তাল্পতা বেশী ঘটে, কেননা এই সময় প্রাপ্তির তুলনায় লৌহের প্রয়োজন বেশী হয়ে পড়ে। তাছাড়া কিশোরীদের ক্ষেত্রে মাসিক রক্তক্ষরণ ঘটায় রক্তাল্পতার সম্ভাবনা বেশী। কৃমির, বিশেষ করে হুক কৃমির, আক্রমণেও এই রোগ জন্মাতে পারে। মূলত রক্তক্ষয় অথবা খাদ্যে লৌহের অপ্রাচুর্য বয়ঃসন্ধির রক্তাল্পতার কারণ।

রক্তাল্পতার প্রাদুর্ভাব ও অগ্রগতি সাধারণত খুব ধীরগতিতে হয়ে থাকে। তাই আস্তে আস্তে হিমোগ্লোবিনের মান কমে যাওয়ার জন্যে শরীর ঐ অবস্থার সংগে মানিয়ে নেয় এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে তেমন ব্যাঘাত ঘটে না এই রোগের জন্য। কিন্তু বিপদ হয় কাজের চাপ বাড়লে, তখন বাড়তি চাপ সামলাবার মত ক্ষমতা ঐ অল্প হিমোগ্লোবিনের থাকে না ও কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

হাঁপানী ঃ সংক্রমণ, এলার্জি অথবা মানসিক কারণে শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রেও এ রোগ আসা সম্ভব। ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া বা দূষিত হাওয়ার মধ্যে বাস অথবা ধূলিকণা, খাদ্য বা ঔষধ প্রভৃতির অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কারণে হাঁপানী জন্মাতে পারে।

যক্ষ্মা ঃ অপুষ্টি, দূষিত পরিবেশ ইত্যাদি কারণই যক্ষ্মার জন্য প্রধানত দায়ী। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে জীবনের দ্বিতীয় দশকে অন্ত্রের ক্ষয়রোগও বেশ ঘটে থাকে। যথাযথ চিকিৎসা হলে বয়ঃসন্ধিকালেই এই রোগের সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাওয়া সম্ভব। এমনকি প্রাক্তন যক্ষ্মারোগী বিবাহ ও সন্তানধারণেও অসমর্থ নয়।

হৃদ্‌রোগ ঃ জন্মগত হৃদ্‌রোগগুলির লক্ষণ কৈশোরে এসে সাধারণত বেড়ে যায়। অথবা শৈশবে যে রোগ সুপ্ত অবস্থায় ছিল বয়ঃসন্ধিতে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেসব হৃদ্‌রোগে নীল হয়ে যাওয়া (cyanosis) বা শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ থাকে সেগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু লক্ষণবিহীন হৃদ্‌রোগ বহুক্ষেত্রেই অবহেলিত অবস্থায় থাকে—কাজের চাপে পড়লে কষ্ট বাড়ে, এবং সেই বিপজ্জনক অবস্থায় নজরে আসে। তাই শিশু ও কিশোরের হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থার নিয়মিত চেক-আপ করার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

উচ্চরক্তচাপ ঃ বয়ঃসন্ধিকালেও উচ্চরক্তচাপে ভোগার ঘটনা খুব বিরল নয়। বিশেষ করে, উচ্চরক্তচাপরোগী বাপ-মায়ের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে নিয়মিত চেক-আপের বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমানের জীবনযাত্রার মানসিক চাপ ছাড়াও বংশান্বয়, স্থূলতা, অতিভোজন ইত্যাদি কারণে কৈশোরেই রক্তচাপ বাড়তে পারে। তাছাড়া এই বয়সে রক্তচাপাধিক্য ঘটার আর একটা বড় কারণ হ'ল বৃক্কপ্রদাহ (nephritis)[৯৩]। বয়ঃসন্ধির রক্তচাপাধিক্য অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই পড়াশোনা বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সামর্থ্যহীনতা ঘটায় না।

যুব মধুমেহ ঃ বয়ঃসন্ধির মধুমেহ রোগ সব থেকে বেশী ঘটে দশ থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে। এই রোগে ভোগা কিশোর-কিশোরীদের সাধারণত স্থূলতা, জননাংগের অপরিণতি, ঋতুবন্ধ ও আবেগপরায়ণতা সংশ্লিষ্ট থাকে। তাছাড়া বয়ঃসন্ধিকালের বৃদ্ধিহারও হ্রাস পায়। অবশ্য চিকিৎসা হলে বৃদ্ধিহার নিয়মমত হয়ে থাকে।

বর্তমানযুগেও এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব নয়—এ কথা সহানুভূতির সংগে কিশোরবয়সী রোগীকে জানানো প্রয়োজন এবং সেইমত তার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা দরকার, যাতে করে সে জানে যে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রিত জীবনধারা ও নিয়মিত ইনসুলিন গ্রহণের সাহায্যে সে সহজ জীবনযাপন করতে পারবে এবং তার পড়াশোনা ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে পারবে অন্য সমজুটিদের মতই।

চর্মরোগঃ তরুণবয়সে দেহের চামড়া, বিশেষ করে মুখের চামড়া, সম্পর্কে সংবেদনশীলতা তীক্ষ্ণ থাকে। তাই সাধারণ পত্র-পত্রিকাতেও ত্বকচর্চা সম্পর্কে দু-এক কথা থাকেই বিজ্ঞাপন ও সাধারণ আলোচনা হিসাবে। এবিষয়ে আলোচনা তাই নিশ্চয়ই বাহুল্য হবে না।

প্রথমেই ধরা যাক্ ব্রণর (acne vulgaris) কথা। কৈশোরের অনেকখানি সময় ধরে, বিশেষ করে, কিশোরীদের ক্ষেত্রে চৌদ্দ থেকে সতের এবং কিশোরদের ক্ষেত্রে ষোল থেকে উনিশ বছর বয়ঃক্রমে[৭৪], এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী ঘটে। তারপর, আপনা থেকেই যথাসময়ে ব্রণগুলি মিলিয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তারেরা এই স্বাভাবিক অবস্থাকে পাত্তা না দিলেও, বিশেষ করে কিশোরীরা মুখের চামড়ার এই বিকারে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আগেই বলা হয়েছে, যৌনোদ্গমের অগ্রগতির সংগে সংগে এড্রিনাল ও যৌনগ্রন্থি থেকে পুংরস বেরিয়ে চামড়ার স্নেহ-গ্রন্থি (sebaceous glands) সমূহের বৃদ্ধি ঘটায় সাধারণত মুখ, গলা, পিঠ, বুক ও মুষ্কথলির চামড়ায়, আর এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গ্রন্থি থেকে বেশী পরিমাণে নিঃসৃত তৈলাক্ত সিবাম গ্রন্থিনালীমুখে আটকে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় ব্রণের। ব্রণ'র ফুসকুড়িগুলো আবার বেড়ে যায় মানসিক চাপ, সাঁৎসাঁতে গরম আবহাওয়া, বা ঋতুপূর্ব মানসিক উৎকণ্ঠার ফলে। প্রসাধনদ্রব্যের অতিব্যবহারেও এগুলি বাড়ে। এই রোগের প্রতিষেধের বিশেষ সহায়ক হ'ল সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলির কঠোর পালন, বিশেষ করে টাটকা ফল ও শাকসব্জী খাওয়া, তৈলজাতীয় খাবার এড়ানো, মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম, নিয়মিত কোষ্ঠসাফ ইত্যাদি। প্রসাধনসামগ্রীর ব্যবহার বরং না করাই ভাল এই অবস্থায়। ভালজাতের সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে ফুসকুড়িগুলিকে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট অবস্থায় থাকতে দিলে এগুলো আপনা আপনি মিলিয়ে যায়। নতুবা, ব্রণ টেপাটেপি করে বেশী হাত

লাগালে স্নেহগ্রন্থিতে সংক্রমণ হয়ে পুঁজ তৈরী হয় ও চামড়ায় দাগের সৃষ্টি হয় চিরকালের মত।

এরপরে আসে, জায়গায় জায়গায় টাক পড়ে যাওয়ার ঘটনা—যাকে বলা হয় alopecia areata—বয়ঃসন্ধিকালে যা খুবই হয়ে থাকে। জায়গায় জায়গায় চুল পড়ে গিয়ে গোল বা ডিম্বাকৃতির টাক পড়ে কোনোরকম ফোলা বা ব্যথা ছাড়াই। এ রোগে ভাবনার কিছু নেই, চিকিৎসাও বিশেষ কিছু জানা নেই—সেরে গেলেই ভাল হয়ে যায়।

এছাড়া হাতের চেটো বা পায়ের পাতায় অতিস্বেদ বা অতিরিক্ত ঘর্মনিঃসরণ (hyperhidrosis) বয়ঃসন্ধিকালের খুব সাধারণ ঘটনা, বিশেষ করে দুশ্চিন্তার সময়ে। কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই রোগ খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

চামড়ায় ঘা, খোস, পাঁচড়া, দাদ, চুলকনা ইত্যাদি ঘটনা কৈশোরে খুবই ঘটতে দেখা যায়। যেসব ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্নান, অন্তর্বাস সাফ করা বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যানুশীলন সম্পর্কে অনাগ্রহী, তাদেরই চামড়ায় সংক্রমণজনিত যে কোনো ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া, নাইলন-টেরিলিন দিয়ে তৈরী কাপড়-জামা-মোজা পরার কারণে বা পাউডার-লিপষ্টিক-সিঁদুর-নেলপালিশ-শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহারে এলার্জির কারণেও চামড়ায় ফুসকুড়ি থেকে আরম্ভ করে ঘা পর্যন্ত ঘটতে পারে। এইসব ধরণের চর্মরোগের ক্ষেত্রে প্রতিষেধের থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থাই প্রকৃষ্টতর। এসব ছাড়া কিশোরীরা অনেক সময় স্নায়বিক কণ্ডূয়ন (itch) বা চুলছেঁড়া (trichotillomania) রোগে ভোগে মানসিক কারণে।

গলগণ্ড: বয়ঃসন্ধির বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের সংগে তাল রাখবার জন্য থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও ফলে এই গ্রন্থির এমন আয়তন বৃদ্ধি ঘটে যে বাইরে থেকেই গলার সামনে চোখে পড়ার মত এক স্ফীতি ঘটে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। অবশ্য বিশ-বাইশ বছর বয়সে আপনা থেকেই এই ফোলা কমে যায়। তবে এই উঠতি বয়সের সাময়িক গলগণ্ডের (puberty goitre) থেকে আয়োডিনের অভাবজনিত গলগণ্ড বা থাইরয়েডগ্রন্থির অতিক্রিয়ার অবস্থাকে আলাদা করে নির্ণায়ণ করা দরকার। এই ফোলা যখন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে তখনই ভাবনার কথা এবং শল্যচিকিৎসাবিদের পরামর্শের প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

স্তনস্ফীতি ঃ যৌনোদ্গমের সহগামী স্তনপ্রদাহ, অকালবৃদ্ধি, অতিবৃদ্ধি বা পুংস্তনস্ফীতি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে এইসব অবস্থার বেশীর ভাগই বিনা চিকিৎসায় উপশম হয়ে থাকে। তবে পুংস্তনস্ফীতিতে অনেক সময়ে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া কচিবয়সে স্তনের অকাল অতিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময় সৌন্দর্যের খাতিরে স্তনের খানিক অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধির শেষভাগে অনেকসময় স্তনে ফোঁড়া হয়ে পুঁজ জমতে পারে। তখন তা কেটে পুঁজ বার করে দেওয়া দরকার। তাছাড়া স্তনে 'আব' (fibroadenoma) হলে তা কেটে বাদ দেওয়ার জন্য শল্যবিদের শরণাপন্ন হওয়া দরকার হয়ে পড়ে।

মুখমণ্ডলের বিকৃতি ঃ মুখমণ্ডলের বিকৃতির চেয়ে কৈশোরে আর কোনো অবস্থাই এত ভয়াবহ ঠেকে না, কারণ মুখমণ্ডল সম্পর্কে বয়ঃসন্ধি অত্যন্ত স্পর্শকাতর—মুখ দেখাতে না পারার চেয়ে লজ্জাকর এই উঠতি বয়সে আর কিছু নেই। তাই জন্মগত ত্রুটি, চেরা-ওষ্ঠাধর (harelip) বা চেরা-তালু (cleft palate) শৈশবে অবহেলিত হলেও এই বয়সে এসে জরুরী চিকিৎসার অংগীভূত হয়ে পড়ে। তাছাড়া বৃদ্ধিবিকাশের অসামঞ্জস্য থেকে জাত চেপ্টা নাক, বাদুড়-কান, ঝোলা-চিবুক বা উঁচু-দাঁত ইত্যাদি যা কিছু মুখমণ্ডলকে বিকৃত করতে পারে, তা সবই কৈশোরে যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শল্যবিদ্‌রা এই ধরণের রোগী এই উঠতি বয়সেই পেয়ে থাকেন। সুখের কথা এই যে অধিকাংশ বিকৃতিই শল্যচিকিৎসায় অপনোদন সম্ভব।

মূত্রতন্ত্রীয় ব্যাধি ঃ সাধারণত মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রে রক্তক্ষরণ, ঘুমন্ত অবস্থায় মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব হারানো ইত্যাদি মূত্রতন্ত্রীয় অস্বাভাবিকতা বয়ঃসন্ধিকালে বেশ ভালরকমই ঘটে থাকে। বিবাহিতা কিশোরীরা অবিবাহিতাদের চেয়ে বেশী ভোগে এই ধরনের রোগে।

মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ (pyelonephritis) ও মূত্রথলির প্রদাহ (cystitis) সাধারণত দীর্ঘকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা, অপ্রচুর পানীয় গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যবধানে মূত্রথলি খালি করার অনীহা ইত্যাদি কারণে প্রধানত কিশোরীদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। কৈশোরবিবাহের নববিবাহিতাদের বহুক্ষেত্রে এই অসুস্থতা ঘটে বলে একে অনেকে 'মধুযামিনী মূত্রথলিপ্রদাহ' (Honeymoon cystitis)

বলে থাকে। মূত্রতন্ত্রের এই প্রদাহকে বেশীদিন অচিকিৎসিত অবস্থায় ফেলে রাখলে ভবিষ্যতে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে[৭৩]।

বিছানা-ভেজানো রোগে (bed wettting) ঘুমন্ত অবস্থায় মূত্রত্যাগ ঘটে থাকে। যদিও বয়ঃসন্ধিকালে শৈশবের এই স্বাভাবিক রোগটা আপনা থেকেই চলে যাওরার কথা, তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৈশোরেও এই বিছানা-ভেজানো রোগ বহু সময়ই অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে। সাধারণত এর পেছনে যে কারণগুলি থাকে তার মধ্যে বিলম্বিত বয়ঃসন্ধি, মানসিক অপরিণতি, পেটে কৃমি, মূত্রতন্ত্রের কোনো রোগ, যুব মধুমেহ, মৃগীরোগ ইত্যাদি অস্বাভাবিকতাই প্রধান।

অস্থিরোগ ঃ বয়ঃসন্ধির সময়ে শক্তি ও উত্তেজনায় টগবগে কিশোরকুল হঠকারী স্বভাবে নানা কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে সহজেই, আর অভিজ্ঞতা অল্প থাকায় এই ধরনের প্রবণতা তাকে বহু দুর্ঘটনার সম্মুখীন করে। ফলত হাড়গোড় ভাঙার ঘটনা এই উঠতি বয়সে খুবই ঘটে থাকে। দুরন্ত কৈশোরে অক্ষকাস্থি ভাঙেনি এমন পুরুষ খুঁজে পাওয়া ভার।

আঘাতজনিত কারণে হাড়-ভাঙ্গা ছাড়াও পেশীকণ্ডরা বা লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা খুব কম নয়। তাছাড়া হাঁটুতে বা অন্যান্য সন্ধিতে আঘাতের কারণে রস জমে ফুলে যেতে পারে। ফুটবল খেলোয়াড়দের তো প্রায়ই ঘটে এ অবস্থা। আবার, ক্রীড়ানুশীলনকারীদের ক্ষেত্রে অতিব্যবহারজনিত অস্থি-পেশী বৃদ্ধি (overuse syndrome) ঘটে থাকে, যেমন, সাঁতারুর কাঁধ, লম্ফ-বীরের হাঁটু, দৌড়বাজের গোড়ালী বা টেনিস খেলোয়াড়ের কনুই ইত্যাদি। এ অবস্থাগুলো আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে, সুতরাং সময়মত ব্যবস্থা নিলে চিরস্থায়ী পরিবর্তন প্রতিরোধ সম্ভব। এসব ছাড়াও আঘাত লেগে যদি প্রান্তিক এপিফিসিস তরুণাস্থি ছিঁড়ে বা ভেঙ্গে যায় তাহলে কতকধরনের হাড়ের গোলমাল হতে পারে, যেমন, উরুর অন্তর্বক্রতা (coxa vara) ইত্যাদি।

আবার সংক্রমণজনিত অস্থিপ্রদাহ, যেমন, রিউমাটিক বাত অথবা অস্থি বা অস্থিসন্ধির ক্ষয়রোগ, এই বয়সে বেশ দেখা যায়। জন্মগত বা বৃদ্ধিকালীন বৈকল্যগুলি যদিও শৈশবেই ধরা পড়ে, তবু এই বয়সে এসেই সেগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। বিশেষ করে দেহকাণ্ডের দু'পাশের সমবিকাশ না ঘটলে

পার্শ্ববক্রতা (scoliosis) বঃয়সন্ধিকালেই প্রকট হয়। শৈশবের কুশ-পা (club foot), ঠোকা হাঁটু (genu valgum) বা ফাঁক হাঁটু (genu varum) যদি অচিকিৎসিত অবস্থায় থেকে থাকে তো এই কর্মচঞ্চলতার বয়সে সমস্যা-সংকুল হয়ে দাঁড়ায় এবং হাড়ের ডাক্তারের চিকিৎসার দরকার হয়ে পড়ে।

গলার গণ্ডগোল: টনশিলের প্রদাহ (tonsillitis) বা গলবিলের লসিকাতন্ত্রের প্রদাহ (adenoids) সব থেকে বেশী ঘটে থাকে বয়ঃসন্ধির প্রাক্কালে বা প্রথম ভাগে। আগেই বলা হয়েছে-বয়ঃসন্ধির বৃদ্ধি, বিকাশের সংগে সংগে লসিকাতন্ত্রের হ্রাস ঘটে থাকে এবং গলদেশের এই গ্রন্থিগুলি লসিকাতন্ত্রের অংশ হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই এগুলি কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোনো কারণে এগুলি না কমলে বা সংক্রমণজনিত কারণে এগুলির স্ফীতি ঘটলে শ্বাসপথে বাধার সৃষ্টি হয়। এই সব লসিকাগ্রন্থির রোগে তাই রোগী ঘুমের সময় জোরে নাক ডাকে ও হাঁ করে শ্বাসকার্য চালায়। এই সব রোগীরা সাধারণত দুর্বল-স্বাস্থ্য হয় ও প্রায়শই ফুসফুসের রোগে ভোগে। এমন কি বেশীদিন ভোগার ফলে শোনারও গণ্ডগোল হয় আর তাতে লেখা-পড়ার ব্যাঘাত ঘটে। আর গলবিল প্রদাহ (pharyngitis) হয় সাধারণত ঠাণ্ডা লাগলে বা হাওয়ার ধূলা বা ধোঁয়া থেকে। তাছাড়া এই উঠতি বয়সে ধূমপানের অভ্যাস জন্মালে তো কথাই নেই। তখন ঘন ঘন খুকখুকে কাশি ও গলায় ঘা হওয়াও খুবই সাধারণ ঘটনা। এছাড়া এলার্জিঘটিত কারণে নাসিকা প্রদাহ (rhinitis, sinusitis) থেকেও কিশোর-কিশোরীরা বেশ ভোগে।

কর্ণপ্রদাহ: খেলাধূলা বা সাঁতারের সময় কানে ধূলাবালি বা জল ঢুকে কানে সংক্রমণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া কিছু কিশোর-কিশোরীর অভ্যাস থাকে বিনা কারণে কান খোঁচানো, তার থেকে কানের পর্দায় আঘাত লেগে যাওয়া বা কানের ভিতরে ফোঁড়া হওয়া বিচিত্র নয়। আবার নাক বা গলার প্রদাহ থেকেও কানের মধ্যকক্ষের প্রদাহ (otitis media) হতে পারে ও তার ফলে কানের পর্দায় গর্ত হয়ে কান থেকে অবিরত পুঁজ পড়া ও কানে কম শোনার অবস্থা বয়ঃসন্ধিকালে বেশ দেখা যায়।

চক্ষুরোগ: বেহিসাবী ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া তারুণ্যের স্বধর্ম। তাই আঘাতের সম্ভাবনাও স্বাভাবিক। আর এ সম্ভাবনা কিশোরীদের

তুলনায় কিশোরদের ক্ষেত্রেই বেশী। চোখে আঘাত লাগা তাই বয়ঃসন্ধিকালে খুবই ঘটে থাকে। ধূলাবালির ঝাপটায়, নখের খোঁচায়, কিম্বা হোলির রং বা প্রসাধন দ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়ায়, অথবা বাজির ফুলকি থেকে বা স্কুল কলেজের প্র্যাক্টিকাল ক্লাশে অসাবধানতায় চোখে আঘাত লাগা আশ্চর্য নয়। তাছাড়া কলে কারখানায় যেসব কিশোর কিশোরী কাজ করে বা জঞ্জাল সাফা করার কাজে লাগে তাদেরও চোখে আঘাত লাগা সম্ভব। ফুটবল, হকি-ক্রিকেটের বলের আঘাতে, হকিষ্টিকের বা ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেটের ঘা খাওয়া কিম্বা ঘুঁসোঘুঁসির ধাক্কায় চোখে আঘাত লাগার ঘটনা বয়ঃসন্ধিকালে খুবই পাওয়া যায়। যে ভাবেই আঘাত লাগুক না কেন যথাশীঘ্র যথাবিহিত চিকিৎসার ব্যবস্থা বিশেষ জরুরী।

আঘাত ছাড়া বয়ঃসন্ধিকালে চোখের গণ্ডগোলের বেশীর ভাগ জুড়ে আছে দৃষ্টিশক্তির গোলমাল। বয়ঃসন্ধিকালে যখন দৃষ্টিশক্তির ব্যবহারের প্রসারতা বাড়ে, যখন পড়াশোনার চাপ বাড়ে, তখন শৈশবের বা জন্মগত ত্রুটিগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। তার আগে হয় তো ধরাই পড়ে না। কৈশোরে সব থেকে বেশী পাওয়া যায় দূরদৃষ্টির অভাব (myopia), তারপর স্থান নেয় বিষমদৃষ্টি (astigmatism), আর সবথেকে কম হয় নিকটদৃষ্টির অভাব (hyper-metropia)[২৫]। বৃদ্ধিকালীন গণ্ডগোলের ফলেও মায়োপিয়া হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ অন্তঃরসের বা পুষ্টির গোলমালে অক্ষিগোলকের ঠিকমত বাড় না হতে পারলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া জন্মগতভাবে ছোট অক্ষিগোলকও এর কারণ হতে পারে। যথাসময়ে এই ধরণের ক্ষীণদৃষ্টির সংশোধন না হলে ভবিষ্যতে চোখের ভিতরে, বিশেষ করে অক্ষিপটে (retina), গোলমাল বাধতে পারে, এমন কি রেটিনা ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনাও খুব একটা বিরল নয়। নিকটদৃষ্টির অভাব বয়ঃসন্ধিকালে খুব একটা ভোগায় না, কেননা এই বয়সে চোখের পেশীগুলি খুবই সক্ষম থাকার ফলে এই দোষ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। তবে বিষমদৃষ্টির ঠিকমত সংশোধন করে নিয়তব্যবহারের চশমা না জোগালে মাথার যন্ত্রণা নিত্যসংগী হয়ে পড়ে।

১৫

বয়ঃসন্ধিকালীন স্ত্রীরোগ

বয়ঃসন্ধির প্রধান পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ। শৈশব থেকে যা ছিল শুধুমাত্র বহিরংগের পরিচয় মাত্র, এই বয়সে এসে গঠনগত ও কার্যগতভাবে সেই লিংগভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় শরীরের বহিরংগে ও অন্তরংগে। শুধু দেহগত নয় মানসিক জগতেও হয় বিরাট এক বিস্ফোরণ—যার ফলে কালকের শিশু আজ কিশোর বা কিশোরী হিসাবে তার লিংগসত্তা নিয়ে সমাজে পরিচিত হয়।

বয়ঃসন্ধির এই লিংগভেদ এতটা প্রাধান্য পায় এই কারণে যে তখন এরা Capable of begetting or bearing children[১৪]—জননক্ষমতার উদ্ভব হওয়ার সংগে সংগে বয়ঃসন্ধি যাত্রা শুরু করে বয়স্ক হওয়ার দিকে। জননতন্ত্রের দিক দিয়ে কিশোরীরা কিশোরদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে আছে—কেননা এদের জননতন্ত্র এক চক্রাবর্তে সতত কার্যশীল আর এদের আছে গর্ভধারণ ক্ষমতা। আর সেই সংগেই জন্ম নিয়েছে স্ত্রী-জননতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া থেকে বিচ্যুতি—অর্থাৎ 'স্ত্রীরোগ'। তাই হাসপাতালে আর সব বিভাগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রবেশাধিকার থাকলেও যেমন "প্রস্থতি ও স্ত্রীরোগ" বিভাগের আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি শুধুমাত্র কিশোরীদের স্ত্রীরোগ সম্পর্কেও আলাদা আলোচনা আবশ্যকীয়।

কিশোরীদের স্ত্রীরোগ সম্পর্কে তারা নিজেরা যতটা উৎকণ্ঠিত না হয়, অভিভাবকেরা হ'ন তার থেকে বেশী। ফলত স্ত্রী-জননতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার একটু আধটু এধার ওধার হলেই ডাক্তারদের নজরে আনা হয়। কিন্তু স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞদের বিপদে পড়তে হয় এই বয়ঃসন্ধির রোগিণীদের নিয়েই। কেননা, শিশুদের মত এরা চুপচাপও নয়, আবার বড়দের মত বুঝদারও নয়; স্থতরাং পরীক্ষার সময়ে. বিশেষ করে অন্তরংগ পরীক্ষাতে, এরা বাধা দেয়। আর তার ফলস্বরূপ অনেক সময় রোগনির্ণয়ে বিভ্রান্তি এসে পড়ে।

যথার্থ গোপনীয়তার অভাব ঘটলে কিশোরীরা সময় সময় দায়িত্বজ্ঞানহীন অসহযোগী হয়ে ওঠে। সব থেকে ভাল হ'তো যদি এদের জন্যে বিশেষভাবে গোপনীয়তা-সম্পন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকতো এবং 'কৈশোর বিশেষজ্ঞ'

চিকিৎসকদের হাতে এরা পড়তো। কারণ, ভীড়াক্রান্ত হাসপাতালের বহির্বিভাগে না দেওয়া যায় এদের ওপর বিশেষ নজর, না নেওয়া যায় এদের বিশেষ রোগের যত্ন, তাই বহুক্ষেত্রেই জননতন্ত্রীয় রোগে আক্রান্ত কিশোরীরা বিচক্ষণ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার ফলে বহু কিশোরীই তাদের জননযন্ত্রজনিত রোগ সম্পর্কে উদাসীনতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

বেশীর ভাগ স্ত্রীরোগই বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কিশোরীকে অল্পাধিক সমানভাবেই বিব্রত করে। তবে বিবাহিতাদের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের রোগ দেখা দেয়, তা বিবাহ ব্যাপারটা নিজেই জন্ম দেয়। কিশোরীরা সাধারণত যেসব জননতন্ত্রীয় অস্বাভাবিকতাতে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

শ্বেতপ্রদর ঃ বয়ঃসন্ধিকালে সাদাস্রাবের ঘটনা খুবই ঘটে থাকে। এই লক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণাটা কিন্তু বড় গোলমেলে। গোলমালটা আরো বাড়ে যখন কিশোরী আর তার মা স্থিরনিশ্চয় হয় যে এই সাদাস্রাবের কারণে সে দুর্বল নির্জীব হয়ে পড়ছে, এমনকি তার খাওয়াতেও রুচি হচ্ছে না। তাদের বোঝানোই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে যে ঐ সব ক্ষুধামান্দ্য বা দুর্বলতা সম্পূর্ণ অন্য কারণে ঘটছে, সাদাস্রাবের কারণে নয়।

ঋতুস্রাবেরর ঠিক আগে বা পরে স্বাভাবিকভাবে জননপথের স্থানিক গ্রন্থিগুলির অতিক্ষরণ ঘটে, যাকে ভুল করে সাদাস্রাব হিসাবে ধরা হয়। দুর্বল স্বাস্থ্য, পুষ্টির অভাব, পেটে কৃমির অবস্থান, ক্ষয় রোগ ইত্যাদি কারণেও সাদাস্রাব হতে পারে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানের অভাবে, যেমন নোংরা অন্তর্বাস-জাঙ্গিয়া পরিধান, নোংরা কাপড় দিয়ে ঋতুকালীন প্যাড ব্যবহার, শৌচকার্যে নোংরা জল ব্যবহার ইত্যাদি কারণে, ভগনালীতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়ে সাদাস্রাব ঘটাতে পারে। আবার সমকামিতায় ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন জিনিষ থেকেও ভগনালীতে সংক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া মনিলিয়া, ক্যাণ্ডিডা, ট্রাইকোমোনাস জাতীয় বীজাণুর সংক্রমণ সাদাস্রাবের সৃষ্টি করে। শ্বেতপ্রদরের এইসব স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কারণ বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে যথাযথ চিন্তা ও প্রতিবিধান কর্তব্য।

ঋতুস্রাবের গণ্ডগোল ঃ বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীরা সবথেকে বেশী ভোগে এই 'মাসিকের গণ্ডগোলে'। এই গণ্ডগোলের প্রথমটা হ'ল

অনিয়মিত ঋতুস্রাব। কিশোরীর প্রথম যৌনোদ্গমে ঋতুচক্র শুরু হওয়ার পরে তিন চার বছর পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ অন্তঃরসক্ষরণের ভারসাম্য না আসা পর্যন্ত অনিয়মিত ঋতুচক্র (irregular cycle) থেকে শুরু করে অপর্যাপ্ত স্রাব (oligomenorrhoea) বা অতিস্রাব (menorrhagia) পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে কালক্রমে অন্তঃরসের স্থৈর্য এসে গেলে স্বাভাবিক নিয়মিত ঋতুচক্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঋতুকৃচ্ছ্রতা বা যন্ত্রণাদায়ক রজোস্রাবের (dysmenorrhoea) ক্ষেত্রে যন্ত্রণা সহ্য করবার ক্ষমতানুযায়ী কষ্টবোধ হয়, তার সংগে থাকে পা ফোলা, মুখ ফোলা, মাথা ধরা, গাঁটে যন্ত্রণা, স্তনে টনটন করা, এমনকি জরজারিও। ঐগুলোকে একসংগে ধরে প্রাক্‌ঋতু লক্ষণ (premenstrual syndrome) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য প্রাক্‌ঋতু লক্ষণ ব্যতিরেকেও ঋতুকৃচ্ছ্রতা ঘটতে পারে। তখন রজোস্রাবকালে তলপেটে অস্বস্তিকর ব্যথা বা খিঁচুনির সংগে কোমরে বেদনা, মাথার যন্ত্রণা ও গা-বমি ভাব ইত্যাদি দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি পালন করলে, খাদ্যপুষ্টির সমতা বজায় রাখলে এবং শুদ্ধ বাতাসে ব্যায়ামাদির অভ্যাস রাখলে এই ঋতুকৃচ্ছ্রতার উপশম ঘটানো যায়।

অতিস্রাব (menorrhagia) ঘটতে দেখা যায় কুড়ি শতাংশ[৯৬] থেকে পঞ্চাশ শতাংশ[৯৭] কিশোরীর ক্ষেত্রে। এই বয়ঃসন্ধির অতিস্রাব ঘটে মূলত পুষ্টিগত কারণে ও অন্তঃরসের অসামঞ্জস্যের ফলে। তাছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে রক্তাল্পতা, থাইরয়েড গ্রন্থির অপক্রিয়া, জননযন্ত্রের ক্ষয়রোগ, ডিম্বাশয়ে আব ইত্যাদি। মাঝে মাঝে অতিস্রাব ততটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু বারে বারে এই ধরণের অধিক রক্তক্ষয় ঘটলে রক্তাল্পতা জন্মাতে পারে এবং তখন আশু চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ঋতুবন্ধ (amenorrhoea) তখনই প্রাথমিক (primary amenorrhooa) যখন পনের বছর বয়স পর্যন্ত রজোদর্শন না ঘটে। আর দুই থেকে বারোটি ঋতুচক্রের পর যদি রজোস্রাব বন্ধ হয় তাকে বলা হয় মাধ্যমিক ঋতুবন্ধ (secondary amenorrhoea)। প্রথম ধরণের ঋতুবন্ধের কারণ হিসাবে থাকতে পারে অন্তঃরসের বৈষম্য বা জননতন্ত্রীয় ব্যাধি। তাছাড়া ছিদ্রবিহীন সতীচ্ছদ (imperforate hymen) বা ভগনালী-প্রাচীরের অবস্থানের কারণে যদি ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে, তখন তাৎক্ষণিক শল্যচিকিৎসা জরুরী হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ধরণের ঋতুবন্ধের প্রধান কারণ গর্ভাধান। তাছাড়া অন্তঃরসবৈষম্য বা

ডিম্বাশয়ের রোগ এই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। অন্যান্য শারীরিক ব্যাধির কারণে অথবা প্রশান্তক (tranquilizer) ঔষধের অতিব্যবহারের ফলেও এই ধরনের ঋতুবন্ধ ঘটতে দেখা যায়। মানসিক আবেগের ওপর ঋতুচক্র অংগাংগী সংশ্লিষ্ট। তাই কোন কারণে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হলে অল্পবয়সী মেয়েদের ঋতুবন্ধ ঘটতে প্রায়ই দেখা যায়[৯৮]। বলাৎকার বা সহসা প্রিয়তমবিচ্ছেদজনিত কারণে আবেগাঘাত ঘটলে ঋতুচক্র বিশৃংখল হয়ে যেতে পারে। গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সংগম অনেক সময়েই গর্ভাধান ভীতির সৃষ্টি করে ও সেসব ক্ষেত্রে ঋতুবন্ধ হতে দেখা যায়।

সংগমক্লেশ ঃ বিবাহিতা কিশোরীদের অনেকেরই বিশেষ সমস্যা এই সংগমকালীন কষ্ট ; কেউ কেউ অবশ্য লজ্জায় মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না। এর পিছনে প্রধান কারণ অবশ্য যথার্থ যৌনজ্ঞানের অভাব। তাছাড়া ভয় বা মানসিক উৎকণ্ঠাও এ ধরণের ঘটনায় বেশ খানিক অংশগ্রহণ করে। সমভাবে বয়ঃসন্ধিকালে যোনীদেশে বা ভগনালীতে আঘাতের ঘটনাও খুব কম নয়। সামান্য ছ'ড়ে যাওয়া থেকে ছিঁড়ে যাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা বলাৎকারের ফলে ঘটতে দেখা যায়। যথার্থ যৌনশিক্ষা অবশ্য এই দুর্ঘটের অনেকাংশেই উপশম আনতে পারে।

বন্ধ্যাত্ব ঃ কৈশোরে বন্ধ্যাত্বের নালিশ এই বাল্যবিবাহের দেশে নেহাত অপপ্রচার নয়। মনে রাখা দরকার, যৌনোদ্গম আর জননক্ষমতা একই সংগে আসে না। রজোপ্রবৃত্তির সময় থেকে দু'তিন বছর পর্যন্ত ডিম্বস্ফোটন ছাড়াই রজোস্রাব হওয়া সম্ভব[৯৯,১০০]। তাই এই ঐ ডিম্বহীনকালে গর্ভাধান হওয়া সম্ভব নয় এবং তাকে প্রকৃত বন্ধ্যাত্ব বলে ধরাও সমীচীন নয়। তবে জরায়ুর অপূর্ণ বিকাশ বা ঋতুচক্রের অনিয়মিততার কারণে যদি কিশোরীর বন্ধ্যাত্ব ঘটে তার চিকিৎসা নিশ্চয় করা দরকার।

কৈশোর বিবাহ (Teenage marriage)

ভারতে কৈশোর বিবাহের হিসাব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুরূহ। তবে জনগণনার হিসাব থেকে খানিকটা আন্দাজ করা যেতে পারে। ১৯৩১ ও

১৯৭১—এই চল্লিশ বছরের ব্যবধানে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের তুলনা করলে দেখা যাবে—

প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় কৈশোর বিবাহের হার

	১০ থেকে ১৪ বৎসর		১৫ থেকে ১৯ বৎসর	
বয়ংক্রম	কিশোর	কিশোরী	কিশোর	কিশোরী
১৯৩১	৪·২	১৭·৪	২৬·৩	৪৪·০
১৯৭১	৪·৩	১১·৬	১৭·৪	৫৬·০

বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহ গ্রামীন অঞ্চলেই বেশী। আবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বাংলায় কিশোরী বিবাহের হার কম।

কমবয়সে বিবাহের প্রতিরোধে ১৯২৯ সালের শিশু-বিবাহ-রোধ আইনই[২৩] সম্ভবত এই ব্যাপারে ভারতের প্রথম আইনবিধি। হরবিলাস সারদা এই আইনের প্রস্তাব করলে জনমত যাচাই করার জন্য যোশী কমিটি নিয়োজিত হয়। এই কমিটির প্রতিবাদন নয়খণ্ড গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলে দেখা যায় শ্রীসারদার প্রস্তাবের পক্ষে জনমত প্রবল। তাই ১৯২৯ সালে এই আইন গ্রাহ্য হলে তাকে লোকমুখে 'সারদা আইন' নামে অভিহিত করা হ'তে লাগল। এই আইনের সংশোধন করে ১৯৪৯ সালে[২৩] পুরুষদের পক্ষে ১৮ বছর ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৫ বছর বিবাহের নিম্নবয়ঃসীমা হিসাবে নির্ধারিত হয়। পরবর্তীকালে লোকসভায় ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে এক বিল উত্থাপিত হয়, কিন্তু সেই সময় লোকসভা খারিজ হওয়ার ফলে আরো পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে লোকসভায় নতুন করে একটি বিল গৃহীত হয়, যাতে স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৬ বছর ও পুরুষের পক্ষে ২১ বছরকে সর্বনিম্ন বিবাহ-বয়ঃসীমা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এই বিল ১৯৭৮ সালে আইন হিসাবে দাঁড়ায়[২৩]। এই আইন পরিবর্তনের পিছনে কারণ হ'ল, যে কোন দেশের জন্মহার বিবাহ-বয়সের সমানুপাতিক। একটি আনুমানিক হিসাবে[১০১] দেখানো হয়েছে যে স্ত্রীলোকের বিবাহের নিম্নবয়ঃসীমা ১৫ বছর থেকে ২০ বছরে ওঠানো হলে জন্মহার প্রাক্তন হারের এক ষষ্ঠাংশ কমে যাওয়া সম্ভব।

এই সব আইনকানুন সত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রায় ২০ শতাংশ বালিকার পনের বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থানে এই হার প্রায় ৩০ শতাংশ। সম্ভবত শিক্ষার উন্নতির জন্য শহরাঞ্চলে একটু বেশী বয়সে বিয়ে হয়ে থাকে। আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশেই শুধু নয় আমেরিকা-ইউরোপের মত উন্নত দেশগুলিতেও কমবয়সে

বিয়ে হওয়ার হার খুব একটা কম নয়। কিন্তু জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সমস্যা মাথায় রেখে সমাজ-বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে একটু মাথা ঘামানো দরকার।

কৈশোর-মাতৃত্বের তাৎপর্য

কিশোরীবয়সে শারীরিক গড়ন সম্পূর্ণ পরিণতি পায় না, তাই ঐ বয়সে মাতৃত্ব এক জৈব ঝুঁকি বিশেষ। বয়ঃসন্ধির বালিকার জৈব পরিণতির সংগে মানসিক পরিণতির অসামঞ্জস্য প্রায়ই কৈশোরের মাতৃত্বে দুর্ঘটনা ঘটায়। কেবল আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশেও কৈশোর-মাতৃত্বের সংখ্যা বর্ধনশীল। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নেওয়া এক পরিসংখ্যানে[১০২] দেখা যায়, গর্ভবতী নারীদের ১২·৮২ শতাংশ কিশোরী এবং তার মধ্যে প্রথম মাতৃত্বের (primigravida) হার ৯·৯৪ শতাংশ। বিলাতী এক পরিসংখ্যানে[১০৩] দেখা যাচ্ছে, কৈশোর মাতৃত্বের হার ৯·৮ শতাংশ।

কৈশোর-মাতৃত্বের সব থেকে ক্ষতিকর দিক হ'ল অল্পব্যবধানে আরো মাতৃত্বের সম্ভাবনা। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে যে কিশোরী প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তাকে প্রায়শই কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে দু-তিন সন্তানের মা হতে দেখা গেছে। এই ধরণের মাতৃত্ব শুধুমাত্র চিকিৎসাব্যাপারেই সমস্যা সৃষ্টি করে না, উপরন্তু মাতৃস্বাস্থ্যের হানি ঘটায় এবং সংসারের সুখশান্তি ও আর্থিক অবস্থা বিড়ম্বিত করে। গর্ভকালীন বিষক্রিয়া (eclampsia, pre-eclamptic toxemia) বা প্রাকপ্রসব রক্তপাতের (ante partum haemorrhage) মত জটিলতা যতটা দেখা যায় কৈশোর-মাতৃত্বে, ততটা কুড়ি-একুশ বছর বয়সের মাতৃত্বে দেখা যায় না[১০২, ১০৪, ১০৫]। এমন কি নবজাতকের অপরিণতি, মৃতবৎসতা ইত্যাদি গণ্ডগোলও কৈশোর-মাতৃত্বের ক্ষেত্রে অনেক বেশী[১০৩,১০৫]।

পনের বছরের কমবয়সী প্রসূতির প্রসবকালীন সমস্যাও গভীর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অস্থিবিকাশ অসম্পূর্ণ থাকায় তাদের শ্রোণিগহ্বরের প্রস্থানপথ ছোট হওয়ার ফলে সিজারিয়ান শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে[১০৬]। বয়ঃসন্ধিকালীন মাতৃত্ব তাই বিজ্ঞানগতভাবে খুব একটা অভিপ্রেত নয়।

অবিবাহজ কৈশোর-মাতৃত্বের সমস্যা

দ্রুতপরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশ, জনসংখ্যার ধরন, বয়ঃসন্ধিকালীন আচরণবিধির পরিবর্তন, জনসংযোগ মাধ্যমগুলির প্রভাব ইত্যাদি উন্নত ও

উন্নয়নশীল দেশগুলির যুবমানসে নতুন সামাজিক ও জৈবিক তাগিদ গড়ে তুলেছে। সামাজিক আস্কারার প্রসারের সুযোগে যৌন আগ্রহ ও তার পূরণের সুযোগ-বৃদ্ধি এবং সেই সংগে জনন-আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে বহুদেশেই। ফলত, বহুক্ষেত্রেই অবিবাহিত অবস্থাতেই কিশোরীদের মাতৃত্ব-বরণের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে।

কিন্তু অবিবাহজ মাতৃত্ব সব দেশেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দশলক্ষ কিশোরী কুড়ি বছর বয়সের নীচে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে এবং এই মাতৃত্বের অর্ধেকই বিবাহ ব্যতিরেকে সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে[১০৭]। ১৯৭১ সালে চিকিৎসকের দ্বারা গর্ভপাত[১০৮] আইনসিদ্ধ হওয়ার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বড় বড় হাসপাতালের বিবরণ [৯৬, ১০৯, ১১০] থেকে জানা যায় যে ভারতেও অবিবাহিত কৈশোর-মাতৃত্বের ঘটনা কম নয়। এছাড়া হিসাববহির্ভূত অনেক মাতৃত্বের ক্ষেত্রে তো হাতুড়ের সাহায্যে গর্ভপাত করা হয়ে থাকে।

সম্প্রতি বয়ঃসন্ধিকালীন এই অবিবাহজ মাতৃত্বের সামাজিক ও মানসিক কারণ সম্পর্কে কিছু কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা হচ্ছে। এই সব গবেষণায়[১১১, ১১২, ১১৩] জানা গেছে যে এই ঘটনা সমাজের সব স্তরেই সম্ভব। তবে এ অবস্থার বলি যারা হয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই শিক্ষাগত মান নীচু, অর্থ নৈতিক মান নিম্নস্তরের, নিয়ন্তক সংসারে কেউ কেউ বা বাড়ীর বাইরে কাজে নিযুক্ত বা কোনো কৈফিয়ৎ ছাড়াই ঘরের বাইরে থাকার স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। তাছাড়া আব্রু-বিহীন বাসস্থানে বাস করার দরুণও এই ধরণের ঘটনা আকছার ঘটে। তবে এটা ঠিক যে যেসব কিশোরী অবিবাহজ মাতৃত্বের বলি হ'য়ে থাকে, তাদের সকলেই প্রায় জননবিজ্ঞান ও জন্মপ্রতিরোধ সম্পর্কে কিছুই জানে না বা সামান্য মাত্র জানে।

গর্ভপাত

বয়ঃসন্ধিকালে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব শুধুমাত্র সামাজিক নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও সমস্যা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বালিকা বা তার অভিভাবকরা চুপিচুপি হাতুড়েদের শরণাপন্ন হন অনাকাংখিত মাতৃত্বের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে। ফলে বহুক্ষেত্রেই জীবনাশংকা সৃষ্টি হয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। অবশ্য গর্ভপাত আইনের [১০৮] প্রসার অনভিপ্রেত মাতৃত্বের এইসব দুর্ভাগ্য-

জনক পরিণতি থেকে ভাগ্যহতা কিশোরীদের বাঁচার এক সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু কিশোরীরা সাধারণত অভিজ্ঞতার অভাবে বা অজ্ঞতাবশত অথবা গোপনীয়তার খাতিরে প্রায় ছ-সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অপেক্ষা করার পর গর্ভপাতের জন্য চিকিৎসকের সামনে হাজির হয়, তখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে গর্ভপাত খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে এবং বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে [১১৪]। সুতরাং অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ধরা পড়লেই সংগে সংগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সব থেকে উচিত অবশ্য একথা মনে রাখা যে প্রতিরোধ সর্বদাই প্রতিকারের চেয়ে অধিকতর কাম্য—গর্ভপাত ঘটাবার মত অবস্থা অর্থাৎ গর্ভাধান যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা নেওয়াই তাই যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ।

গর্ভনিরোধ

অনভিপ্রেত মাতৃত্ব বয়স বা বিবাহের ধার ধারে না। আবার বর্তমান সমাজের 'যৌনবিপ্লব'কে ঠেকিয়ে রাখার জন্য কোনো নীতি-উপদেশ দিয়ে বাস্তবকে চোখ ঠারাও বাতুলতা মাত্র। সুতরাং একথা মনে রাখা ভাল যে কিশোরীরা যৌনতাসম্পন্ন ও তাদের মাতৃত্ব-সম্ভাবনাও প্রবল। তাই American Academy of Pediatrics ১৯৭১ সালের এক প্রতিবেদনে বলেছেন, "The teen-age girl whose sexual behavior exposes her to possible conception should have access to medical consultation and the most effective contraceptive advice and methods consistent with her physical and emotional needs". বয়ঃসন্ধির জন্য জন্মনিরোধক ব্যবস্থার ঔচিত্য সম্পর্কে অনুরূপ উপদেশ American College of Obstetricians and Gynecologists-ও দিয়েছেন।

এটা দেখা গেছে যে কৈশোর-মাতৃত্বের জন্য যারা গর্ভপাত ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়, তাদের কেউই প্রায় জন্মনিরোধক ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে না। বিশেষ করে এদের জন্যই গর্ভনিরোধক পরামর্শের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিবাহিতা কিশোরীদের জন্যও, কেননা অল্পবয়সে কৈশোর-মাতৃত্বও আকাংখিত নয়।

গর্ভনিরোধের নানা প্রক্রিয়া আছে। সকল কিশোরীর পক্ষে একটিমাত্র প্রক্রিয়াকেই প্রকৃষ্টতম বলে আখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই গর্ভনিরোধক

পরামর্শে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সুবিধা অসুবিধাগুলি আলোচনা করে কোনজনের পক্ষে কোনটা সর্বোত্তম তার নির্ধারণ অবশ্যকর্তব্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, 'পিল' গ্রহণ কিশোরীদের কাছে জনপ্রিয় ও নিরাপদ বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু পিল-এর উপাদান যৌনরসগুলির (sex steroids) দীর্ঘকালীন ব্যবহারপ্রযুক্ত কুফলসমূহ সম্পর্কে তাদের অবহিত করার জন্য বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই প্রসংগে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা অন্যত্র বহু হয়েছে। তাই এই গ্রন্থে তার বিশদ ব্যাখ্যা বাহুল্যবোধে বর্জিত হ'ল।

১৬

বয়ঃসন্ধিকে নিয়ে সামাজিক সমস্যা

তারুণ্যের অপরাধ (juvenile delinquency) বা কিশোর-কিশোরীদের সমাজবিরোধী আচরণ বর্তমান সমাজে সব থেকে সংকটজনক বয়ঃসন্ধি-সমস্যা। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে তারুণ্যের এ অবস্থা হ'ল মানিয়ে নেওয়া বা সমন্বয়ের অভাব। কিন্তু সমাজের সংগে সমন্বয়ের অভাবে সকলেই অসামাজিক হয়ে যায় না, আবার সব সমাজবিরোধী তরুণ-তরুণীরই সমাজের সংগে সমন্বয়ের অভাব ঘটে না।

তরুণ অপরাধীদের ক্ষেত্রে তাই বয়স্ক অপরাধীদের তুলনায় অন্যতর ব্যবস্থা অবলম্বনের ধারণা করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। ইংলণ্ডের আইনে[১১৫] এই বিধি আছে যে দশ বছরের নীচে শিশুদের অভিযুক্ত করা যাবে না এবং সতের বছরের ওপরে কিশোরদের উপর বয়স্ক আইনের প্রয়োগ করা যাবে। তরুণ অপরাধীদের সম্বন্ধে পশ্চিমবংগীয় আইনে[১১৬] অবশ্য ছেলেদের ক্ষেত্রে যোল বছর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে আঠার বছর বয়স বাঁধা হয়েছে, কিন্তু নিম্নতম বয়ঃসীমা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। এই আইনে তরুণ অপরাধীদের শোধনাগারে (Reformatory ; Borstal School) পাঠানোর বিধি আছে।

সমাজবিরোধী তরুণ-তরুণীদের প্রধান প্রধান অপরাধক্রিয়া হ'ল চুরি, রাহাজানি, বাড়ী বা স্কুল থেকে ঘনঘন পালানো আর যৌন অপরাধ। এছাড়াও জীবনের এই দ্বিতীয় দশকের আচরিত অন্যান্য অপরাধের মধ্যে পড়ে পরীক্ষায় টোকাটুকি, বিনা টিকিটে ভ্রমণ ইত্যাদিও।

U.N. Congress of Crime (1960)-এর বিবরণে জানা যায়, কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি পত্রিকার বিবরণে[১১৭] জানা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানি, চুরি ইত্যাদি সাংঘাতিক দুষ্কর্মের অর্ধেকেরও বেশী দশ থেকে সতের বছর বয়সী অপরাধীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। আরো জানা যায় যে কিশোরীরাও দিন দিন সাংঘাতিক অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ছে। FBI-এর বিবরণে জানা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের বহু শহরে স্কুলগুলো অপরাধীদের আখড়ায়

পরিণত হয়ে পড়েছে। ১৯৭৬ সালে প্রায় সত্তর হাজার স্কুল-শিক্ষক নির্যাতিত হয়েছেন এবং গুণ্ডামীর ফলে প্রায় ৬০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। যুক্তরাজ্যেও অনুরূপ ১৯৭৬ সালের এক হিসাবে[১১৮] দেখা যায় যে সতের বছরের নীচে ১,২০,৯৫৭টি কিশোর ও ১০,৮০০টি কিশোরী সমাজবিরোধী আচরণের জন্য বিচারালয়ে প্রেরিত হয়েছে।

এই সাম্প্রতিক কৈশোর-অপরাধ বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে ভারতও বাদ যায় নি। CBI-এর বিবরণে[১১৯] থেকে জানা যায় ১৯৬৫ সাল থেকে এক বছরের মধ্যে তরুণ অপরাধীর সংখ্যা শতকরা ৫·২ ভাগ বেড়েছে। পুলিশের সমীক্ষায়ও[১২০] বলা হয়েছে যে ১৯৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭০ সালে অনুরূপ অপরাধীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৫·৪ শতাংশ।

কিন্তু একটা বিরাট প্রশ্ন—দ্বিতীয় দশকের জীবনে কেন এই অপরাধ-প্রবণতা? উত্তর দেওয়া খুবই দুরূহ। সম্ভাব্য কারণের মধ্যে পড়তে পারে—

(ক) মানসিক আবেগের অপরিণতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, নীতি-বোধের অভাব, সম্পত্তি সম্পর্কে অবহেলা, বিবেক ও শৃংখলাবোধের অভাব। আইনবিদ্দের এক প্রতিবেদনে[১২১] দেখা যাচ্ছে, "On account of their vulnerability and dependance they can be exploited, ill treated and directed into undesirable channel by antisocial elements in the community…They often become delinquent by force of circumstances and not by choice".

(খ) লেখাপড়ায় অমনোযোগ, অবহেলিত অসুখী শৈশব, নিজের অবস্থা সম্পর্কে বিরক্তি, নিরাপত্তাহীনতা ও উত্তেজনা সন্ধানের মানসিকতা।

(গ) অসন্তোষজনক সাংসারিক অবস্থা[১২২]। দরিদ্র পরিবারে ভাইবোনের সংখ্যাধিক্য, পারিবারিক আদর-যত্নের অভাব, ভাঙা-পরিবার ইত্যাদি অবস্থার শিকার হয় তরুণরা সহজেই। বয়ঃসন্ধিকালে সাংঘাতিক মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় যদি সংসারের কর্তা (বাবা) দরিদ্র, অল্পশিক্ষিত, অসংযমী, বেকার বা পংগু হয়ে সংসারের ভরণ-পোষণে অসমর্থ হয়। সময় সময় পিতা সংসার সম্পর্কে উদাসীন হয় বা ঝগড়াটে, মাতাল ও অত্যাচারী হয়। আর, সংসারের মধ্যে তরুণরা দীর্ঘকাল ধরে এসব দেখতে দেখতে একদিন এই পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সমাজবিরোধী আচরণের মাধ্যমে।

(ঘ) কুসংসর্গ, কুচরিত্র ও মাদকসেবী প্রতিবেশী, বন্ধু বা সহকর্মীর সান্নিধ্য সহজেই কুকর্মে প্ররোচিত করতে পারে।

(ঙ) মানসিক বৈকল্য ও দৈহিক প্রতিবন্ধিত্ব। অল্পবুদ্ধিতা, মানসিক ব্যাধি, ভগ্নস্বাস্থ্য, দৈহিক পংগুতা ইত্যাদির কারণে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় তাদের এই দুরবস্থার প্রতিশোধ নেয় অপরাধমূলক আচরণের মাধ্যমে।

(চ) মাদকতার প্রভাব। মদ্য ও মাদক ঔষধের প্রভাব যুবসমাজে অপরাধের প্ররোচনা দেয়। এমনকি মাদকপ্রভাব না থাকা অবস্থায়ও নিত্যমাদকসেবীরা অপরাধে লিপ্ত হতে পারে, কেননা এই সব মাদকদ্রব্যের দীর্ঘকালীন ব্যবহার বিচারবুদ্ধি লোপ করে ও যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা ভোঁতা করে দেয়। অবশ্য যৌন অপরাধ সাধারণত মত্ত অবস্থাতেই বেশী ঘটে থাকে।

(ছ) সিনেমাতে অপরাধ ও মারদাংগার দৃশ্য দেখা, অশ্লীল সাহিত্যপাঠ, রাজনৈতিক প্রশ্রয় ইত্যাদির কারণেও যুবশক্তি অপরাধের দিকে ঝুঁকতে পারে। অন্তত বর্তমান নাগরিক জীবনে এগুলো যে বয়ঃসন্ধিকে অপরাধ সংঘটনে প্রবৃত্ত করছে না, তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই ধারণা উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হবার কারণ ঘটছে।

(জ) অধুনাতন বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে[১২৩] যে ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা এই ধরণের অপরাধপ্রবণতার সংগে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। কেউ কেউ সমাজবিরোধী তরুণদের দেহকোষে অতিরিক্ত ওয়াই-ক্রোমোজোমের অবস্থানও দেখিয়েছেন।

তরুণ অপরাধীদের ভবিষ্যাভাসও বিশেষ সন্তোষজনক নয়। কারণ সমাজবিরোধী কিশোরদের শতকরা ৭১ ভাগ ভবিষ্যজীবনে স্বভাব-অপরাধীতে পরিণত হয় এবং কিশোরীদের ৭০ শতাংশের ঘর ভাঙে ও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। কৈশোরের অপরাধ শুধুমাত্র রাষ্ট্রেরই প্রচণ্ড ক্ষতি করে না, অপরাধী কিশোর-কিশোরীর ব্যক্তিত্বেও সর্বকালের জন্য পংগুত্ব এনে দেয়।

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, তরুণ অপরাধীদের শতকরা দশ ভাগ অসংশোধনীয়। যদি এই দশ ভাগকে আলাদা করে রাখা সম্ভব হয়, তাহলে বাকী নব্বই শতাংশকে হয়তো সংশোধনের প্রয়াস নেওয়া সম্ভব হতে পারে। যদিও তরুণ অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট শোধনাগার বা বরষ্টাল স্কুলগুলি "shall not only provide the child with accomodation, maintenance

and facilities for education (or medical assistance) but also provide him with facilities for development of his character and abilities, and give him necessary training for his reformation to ensure all-round growth and development of his personality"[১১৬] বলে উদ্দিষ্ট হয়েছে, তবু বাস্তবে এই সব শোধনাগারে সব ধরণের অপরাধী মেশানো থাকে, যার ফলে লঘু-অপরাধীরা গুরু-অপরাধীদের পাল্লায় পড়ে কালক্রমে বিপজ্জনক হিংস্র অপরাধীরূপে বেরিয়ে আসে।

বয়ঃসন্ধিকালীন দ্বিতীয় প্রধান সামাজিক সমস্যা হ'ল নেশাখোর তরুণদের নিয়ে[১২৪]। প্রথমে ধরা যাক ধূমপানের নেশাকে। স্কুল-কলেজে ছাত্র তার সহপাঠীদের সাহচর্যে ধূমপানে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে প্রধানত এটাই প্রমাণ করার জন্য যে সে যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। কিশোরীরাও তাদের ছেলে-বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তারা যে যথেষ্ট 'ফরোয়ার্ড' সেটা প্রমাণ করার জন্য ধূমপান করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের টিন-এজারদের সম্বন্ধে এক সমীক্ষায়[১২৫] প্রকাশ যে ১৯৬৮ সালে ১৪·৭ শতাংশ কিশোর ও ৮·৪ শতাংশ কিশোরী ধূমপানে অভ্যস্থ ছিল এবং ১৯৭০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৮·৫ ও ১১·৯ শতাংশ। দুঃখের বিষয় ভারতীয় কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কে এরকম কোনো সমীক্ষা সহজলভ্য নয়।

ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে বহুদিন থেকে বহু সাবধানবাণী প্রচারিত হলেও ধূমপায়ীর সংখ্যার বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হচ্ছে না, এটাই আশ্চর্য! দীর্ঘকালীন ধূমপানের অভ্যাসের ফলে ক্যান্সার, গলবিল ও স্বরযন্ত্রের প্রদাহ, হৃদ্‌রোগ, পেপটিক আলসার, যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ ইত্যাদি বহু মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা গেছে। এমন সতর্কবাণীও করা হয়েছে যে প্রতিটি সিগারেটের সংগে সংগে ধূমপায়ীর জীবন থেকে সাড়ে পাঁচ মিনিট হিসাবে খসে যাচ্ছে[১২৬]। ধূমপানের এইসব কুফল কিন্তু আজ আর সর্বসমক্ষে অজানা নয়। তবু ধূমপানের অভ্যাস একবার ধরলে তা আর সহজে ছাড়ে না। কথিত আছে যে ইংলণ্ডের প্রথম জেমসই সর্বপ্রথম ধূমপানকে নিন্দা করে বলেছিলেন, "it is a custom loathsome to the eye, hateful to the nose, harmful to the brain and dangerous to the lungs"; কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তাঁর উত্তরাধিকারীরাই এই উক্তির যথার্থ মর্যাদা দেন নি এবং যতদূর জানা যায়, শেষ

চারজন ব্রিটিশ নৃপতি এমন রোগে মারা গেছেন যেগুলোর জন্য ধূমপানকে দায়ী করা যেতে পারে[১২৭]।

ধূমপানের অভ্যাসের গোড়া মেরে দিতেই তাই অনেকের পরামর্শ যে স্কুলের স্বাস্থ্য-শিক্ষাক্রমে এই বিষয়ে যথাযথ ফলদায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাঁরা বলেন, শিক্ষকরা যদি নিজেরা স্কুলভবনের ভিতরে ধূমপান না করেন, অভি-ভাবকবর্গ যদি ছোটদের সামনে যথাসম্ভব ধূমপানে বিরত থাকেন, তাহ'লে কমবয়সের ধূমপায়ীর সংখ্যা অনেকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। বিশেষ করে, অল্পবয়সীদের কাছে সিগারেট বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত[১২৮]।

বয়ঃসন্ধির তরুণ-তরুণীদের দ্বিতীয় নেশা হ'ল মাদক ঔষধে আসক্তি। বরোদায় ১৪১১ জন চৌদ্দ থেকে উনিশ বছরের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে এক সমীক্ষায়[১২৯] দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশই মাদকপ্রবণ। এই মাদকপ্রবণতার সর্বোচ্চ শিখরে আছে কলেজ-ছাত্ররা, তারপর স্কুল-ছাত্ররা ও সবশেষে কলেজ-ছাত্রীরা। মাদক ঔষধের মধ্যে সব থেকে বেশী ব্যবহার হয়েছে ভাং, তারপরে স্থান নিয়েছে তামাক ও এলকোহল। অবশ্য মেয়েরা পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারেই বেশী অভ্যস্ত। এই বিষয়ে এক সাংবাদিক বিবরণ[১৩০] প্রণিধানেযোগ্য। "ছাত্রাবাসে মাদক আসক্তি বাড়ছে, কেন্দ্র উদ্বিগ্ন" এই শিরোনামে বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন—"বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-গুলিতে ছাত্রদের মধ্যে মদ ও মাদক ওষুধ প্রভৃতির নেশা ব্যাপকভাবে বিস্তারের খবরে ভারত সরকার গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। এই নেশা সব চাইতে চালু ছাত্রবাস-গুলিতে। এই সমস্যাটি প্রথম কেন্দ্রের নজরে আসে ১৯৭১ সালে। কেন্দ্রের তদানীন্তন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলিকে এ সম্পর্কে নজর রাখতে বলেন। এরপর ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়ে বলেন: ছাত্রাবাসগুলিতেও ঐসব নেশা ঠেকাতে ব্যবস্থা নিন। এবং ছাত্ররা যাতে ওই পথে না যায় সে জন্য সচেষ্ট হোন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এ ব্যাপারে কলেজগুলির অধ্যক্ষ, ছাত্রকল্যাণ সংস্থার ডীন, প্রোকটর, ছাত্রবাসগুলির ওয়ারডেন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ছাত্রদের এই মারাত্মক কু-অভ্যাসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দেন।...এই নেশা যেরকম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির

বৈঠকে সদস্যরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।" এই সংগে আর একটি রিপোর্টের উল্লেখ নিশ্চয় অপ্রাসংগিক হবে না, যাতে বলা হয়েছে—হোষ্টেল-বাসী মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে মাদক ঔষধাসক্তির প্রবণতা প্রবল ও এই ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থানে আসে আইন ছাত্ররা[১৩১]।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মাদকাশক্তির সমস্যার জন্য অন্যদেশের সমীক্ষা খুঁজতে হবে না। আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই এ সমস্যা সৃষ্টি করে বসে আছে। ছাত্রসমাজের এক দুর্বল অংশের মধ্যে এই মাদক-নির্ভরতা জন্মায়। অবশ্য এই সব মনঃপ্রভাবী ঔষধের সহজলভ্যতাও আর একটা কারণ। বন্ধুবান্ধবদের দলে পড়ে কিশোর-কিশোরীরা মাদক সেবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে এমন অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে যে সংগী ছাড়াই একা একা ঔষধ সেবনে বাধ্য হয়। মাদকাসক্তির প্রাধান্য দেখা যায় প্রধানত সমাজের উপরতলায়[১৩২]। কেননা এই উচ্চবিত্ত সমাজে থাকে বিশৃংখল পারিবারিক পরিবেশ, পিতামাতার সংগে ছোটদের উপযুক্ত সংসর্গের অভাব, প্রশ্রয়ের আধিক্য আর বর্ধমান অসন্তোষ।

মাদকাসক্তির ব্যাপারে সাধারণত এইসব শ্রেণীর ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

(১) উত্তেজক (Stimulants)—এমফিটামিন জাতীয় ডেক্সিড্রিন, মেথিড্রিন ইত্যাদি ; কোকেন, ম্যানড্রাক্স ইত্যাদি।

(২) বিভ্রান্তক (Illusinogenics)—এল. এস. ডি., হাশিস, মারিয়ুয়ানা ইত্যাদি।

(৩) অবসাদক (Depressants)—বারবিট্যুরেট, গ্লুটাথেমাইড, আফিম-জাত হেরোইন, পেথিডিন ইত্যাদি।

(৪) প্রশান্তক (Tranquilizers)—মেপ্রোব্যামেট, ডায়াজিপাম বা কাম্পোজ ইত্যাদি।

খুব বেশী রকম ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি মাদক সম্পর্কে আলাদা করে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন—

এমফিটামিন সাধারণতঃ ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয়, কারণ বহুল প্রচলিত ধারণা যে এই ঔষধ খেয়ে রাত জেগে পড়া যায়। কিন্তু এই ঔষধের ক্রিয়া পরবর্তী সময়েও টেনে নিয়ে যায় ও অবসাদ সৃষ্টি করে।

কোকেন নিঃসন্দেহে মস্তিষ্ক-উত্তেজক, যৌনপ্রক্রিয়ার বর্ধক এবং সেবনের পরবর্তী সময়ে শান্তি ও সন্তোষের অনুভূতি-প্রদায়ক। কিন্তু বেশীদিন

প্রয়োগের ফলে গা-বমি, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন-হ্রাস, অনিদ্রা, খিঁচুনী, এমন কি মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

এল. এস. ডি. রাসায়নিক যৌগটি বয়ঃসন্ধি-সমাজে খুবই জনপ্রিয়। তাদের বিশ্বাস এই ওষুধটি খেলে মনের প্রসারতা বাড়ায়। কিন্তু দীর্ঘ ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তি ও পেশাগত দক্ষতা নষ্ট করতে দেখা গেছে।

মারিয়ুয়ানা গাঁজা গাছ থেকে উৎপন্ন। এই গাছের পাতা থেকে ভাং বা সিদ্ধি, ফুলের কুঁড়ি থেকে গাঁজা ও মারিয়ুয়ানা এবং গাছের আঠা থেকে হাশিস ও চরস তৈরী হয়। এই মাদকের প্রভাবে সুস্থতা-অনুভূতি জন্মায়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটে, মজাদায়ক পেশী-শৈথিল্য আসে ও প্রায়শই গা-ভাসানোর ভাব জাগে[১৩৩]।

বারবিট্যুরেট ঔষধগুলি সাধারণ ঘুম আনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ঔষধ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে অবসন্ন করে। এর প্রভাবে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি হয় প্রথমদিকে, তারপর আসে দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তির অবসন্নতা এবং সবশেষে তন্দ্রাভাব ও নিদ্রা ঢেকে দেয় সব অনুভূতি।

হেরোইন ব্যবহারের মিনিটখানেকের মধ্যে এক উল্লাস-আবেগ আসে, অনেকে একে যৌন-পরিতৃপ্তির তুল্য মনে করে। তারপর এক তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে আনন্দদায়ক শৈথিল্যের অনুভূতি বজায় থাকে প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী।

পেথিডিনের ফলাফল অনেকটা হেরোইনের মতই। এই ঔষধটি চিকিৎসক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রদের কাছে সহজলভ্য। তাই মেডিকেল ছাত্রসমাজেই পেথিডিনের নেশা বেশি দেখা যায়।

মাদকদ্রব্যের মধ্যে ঔষধরূপী মাদক বাদ দিলে মদ্য বা এলকোহল বিশেষ স্থান নিয়েছে আজকের "পারমিসিভ" সমাজে। ছাত্র-যুব সমাজে শুধুমাত্র উত্তেজনার জন্য মদ্যপানের রেওয়াজ প্রসারিত হচ্ছে—বিশেষ করে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে। কিন্তু উত্তেজনাই এলকোহলের প্রধান কার্য নয়। মদ্যপানের ফলে রক্তের মধ্যে এলকোহলের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে, রক্ত থেকে মস্তিষ্কের স্নায়ুকলার মধ্যে এলকোহলের প্রবেশ ঘটলে, স্নায়ুকোষ অবদমিত হয়ে স্নায়ুর পরিবহণশক্তি কমায়—প্রাথমিক স্তরে সংবেদী অঞ্চলে ও পরবর্তী স্তরে চেষ্টীয় অঞ্চলে। ফলে মদ্যপায়ী প্রথমের দিকে অবসন্ন হয়ে প্রশান্তি পেলেও পরের দিকে চলনে-বলনে অসংযত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের মদ্যপানের অভ্যাসে

শুধু লিভারই পচে না, পচন ধরে মস্তিষ্কে এবং সংজ্ঞাবহ ও আজ্ঞাবহ উভয় ধরনের স্নায়ুতন্ত্রেই। ফলে, বোধ ও স্মৃতির অবনমন ও বিচিত্র সব মানসিক বিকারের শিকার হয়ে পড়ে তরুণ সমাজ[১৩৪]।

বয়ঃসন্ধিকালে মাদকসেবন আসলে আত্মসচেনতার বিকল্প-অনুসন্ধানের অপপ্রয়াস—তা সে সাময়িকভাবেই হোক আর স্থায়ীভাবেই হোক। বয়ঃসন্ধিতে মানসিক বিকাশের চাপ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে সেই চাপের সংগে খাপ খাইয়ে সমাধানের চাইতে বরং সহজলভ্য রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে পরিত্রাণ খোঁজার চেষ্টা হয়। তাই মাদকসেবীরা সাধারণত একাধিক মাদকের শরণাপন্ন হয়, কেননা একটা মাদকে যখন আকাংখিত ফল মেলে না, অন্য একটিকে তার সংগে জুড়ে নিয়ে বাস্তবের থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজা হয়। কিন্তু মাদকদ্রব্যের ক্রমাগত ব্যবহারে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের যেমন ক্ষতি হতে পারে, তেমনি যকৃত ও পাকস্থলির ক্ষত এমনকি ক্যানসারও হতে পারে[১৩৫]।

মাদক জাতীয় ঔষধের খুচরা বিক্রয়ের সম্পর্কে আইন আছে এদেশে[১৩৬]। কিন্তু এই আইন কঠোরভাবে মানা হ'লে দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এত মাদকাসক্তি বৃদ্ধি পেলো কি করে? এই সব মাদক ঔষধ, বিশেষ করে চৈতন্য-লোপী ঔষধ ও মনঃপ্রভাবী ঔষধগুলির অনুমোদিত বিক্রয় সম্পর্কে আইনের আরো কঠোরতর প্রয়োগ হওয়া উচিত[১৩৭]।

একবার মাদকাসক্ত হলে চট করে তা থেকে নিবৃত্ত করানো মুস্কিল। মাদক-প্রবণতার নিবৃত্তি ঘটানোর উপায়গুলো হ'ল—মনোবিজ্ঞানীর সাহায্যে মাদকাসক্তকে সচেতন করে তোলা, অথবা তাকে আনন্দজনক সৃষ্টিধর্মী কাজে নিয়োজিত করা। তাছাড়া মাদকদ্রব্যের বর্ণ-স্বাদ-গন্ধের সাদৃশ্যসম্পন্ন নকল মাদকের ব্যবহারের নির্দেশও কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে। আসলে উপায়গুলো কোনটাই খুব সহজসাধ্য নয়। আর, জীবনের জটিলতার জটগুলো ছাড়াতে না পারলে মাদক-প্রবণতা দূর করার আশা বাতুলতা মাত্র[১৩৫]।

১৭

বয়ঃসন্ধির দুর্ঘটনা

হঠকারী বয়ঃসন্ধি অযথা ঝুঁকি নিয়ে চলে তার প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে। অনভিজ্ঞ অর্বাচীন কৈশোর এক অসতর্কতার প্রতিমূর্তি। কৈশোরের চাঞ্চল্য সাবধানী মনোভাবকে ব্যংগ করে, তার নবার্জিত বিকশিত শারীর-শক্তির আবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদ বাধা তুচ্ছ করে, আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল দুর্ঘটনা। বয়ঃসন্ধির পথপরিক্রমায় ছোট বড় কোন না কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়নি, এমন সাবধানী চতুর তারুণ্য মেলা ভার। এই সব দুর্ঘটনা পথে-ঘাটে এমনকি ঘরে শুয়ে-বসেও ঘটতে পারে। অবশ্য দুর্ঘটনা মাত্রেই দুর্ঘটনা। সব বয়সেই তা ঘটে। তবে বয়ঃসন্ধির দুর্ঘটনা-প্রবণতা অনেক বেশী তার বয়সের স্বভাবধর্মের জন্য, তার দৈহিক বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের সংগে মানসিক বিকাশের অসংগতির জন্য। বিষয়টি তাই বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে, কেননা মৃত্যু থেকে সারাজীবনের মত পংগু হওয়া পর্যন্ত সব কিছুই এইসব দুর্ঘটনা থেকে ঘটতে পারে বয়ঃসন্ধির বয়ঃক্রমে।

প্রথমে আসা যাক **যান দুর্ঘটনার** কথায়। অসতর্কতা যাদের স্বভাবের অংগ তারা পথে ঘাটে গাড়ীচাপা পড়বে, গাড়ীর ধাক্কা খাবে এতে আর আশ্চর্যের কি! তাছাড়া নিজেরা গাড়ী চালাতে গিয়ে উদ্দাম হয়ে যাওয়া বা মাদকাসক্ত হয়ে গাড়ী চালানো থেকেও কিশোররা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। তবে পাশ্চাত্য দেশেই এই সমস্যা বেশী, কেননা আমাদের দেশে কিশোর মোটর-চালকের সংখ্যা খুবই কম। তবে মোটর সাইকেল, স্কুটার বা সাইকেলের আরোহী কিছু কম নয় এদেশে এবং সাইকেল-আরোহীর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সম্ভাবনা মোটর দুর্ঘটনার তুলনায় কিছু কম নয়। বিশেষ করে, অন্য বড় গাড়ীর সংগে ধাক্কা থেকে টাল সামলাতে না পেরে উল্টে যাওয়ার ঘটনা এই দ্বিচক্রযানের ক্ষেত্রে খুব বিরল নয়।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনা হিসাবে আসে **জলে ডুবে যাওয়া**। নদী-মাতৃক দেশে, বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে, জলাশয়ের ব্যবহার বেশ বেশীই হয়ে থাকে। আর তরুণসমাজের হঠকারী চাঞ্চল্য বহু সময়েই জল-দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দেখা দেয়। জলযান দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যার ঘটনা বাদ দিলে, অধিকাংশ জলে ডোবার ঘটনাই অসতর্ক সন্তরণ বা উদ্দাম জলকেলির ফলস্বরূপ ঘটে থাকে এবং বেশীর ভাগ ঘটনার শিকার হয় কুড়ি বছরের কমবয়সী কিশোররাই।

এরপর আসে **আগুনে পোড়া**। বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের সাংসারিক প্রয়োজনে রান্নাঘরে প্রবেশ আমাদের দেশে নেহাত কম নয়—বিশেষ করে নিম্নবিত্ত সমাজে। উচ্চবিত্ত সমাজেও সখ করে রান্নার কাজ করা বা পিকনিক চড়ুইভাতিতে রান্নার কাজে লাগা খুবই হয়। এই সব সময়ে আলগা কাপড়-চোপড়ে অসতর্কতার সুযোগে আগুন লাগতে পারে। বিশেষ করে আজকাল দাহ্য সামগ্রী দিয়ে তৈরী জামাকাপড়ের ব্যবহার, রান্নার গ্যাসের ব্যবহার ইত্যাদি এইসব দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া কর্মস্থানে অসতর্কতা বা লেবোরেটারীতে কাজের সময়েও আগুনে বা এসিডে পোড়ার ঘটনা দেখা যায়। কিশোরদের ক্ষেত্রে বহু সময়েই বিছানায় শুয়ে ধূমপানের কালে নিদ্রাভিভূত হওয়ার দরুণ বিছানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে দেখা গেছে। আর বাজী পোড়ানোর সময়কার দুর্ঘটনা তো অগুনতি। বিশেষত মাদক প্রভাবিত অবস্থায় আগুনে পোড়ার ঘটনা মেলে বিস্তর। আর, অধুনাতন মারদাংগার যুগে বোমা বাঁধতে গিয়ে, নিজের অথবা অন্যের ছোঁড়া বোমার আঘাতে আহত বা নিহত হওয়ার ঘটনা তো ঘটছে আকছারই।

পরবর্তী পর্যায়ে আসে **পতনজনিত দুর্ঘটনা**। গাছে-চড়া উদ্দাম কিশোর প্রায়শই গাছ থেকে পড়ে হাত পা ভাঙে, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে যায়, সময় সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাছাড়া ছাদ থেকে পড়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে তো প্রায়ই দেখা যায়। ঘুড়ি ওড়াবার উৎসবের দিনগুলি প্রায়শই এই রকম দুর্ঘটনার অন্ধকার আনে অনেক পরিবারে। এছাড়া পিছল পথে বা সিঁড়িতে পিছলে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে ঘরের মধ্যে থেকেও। স্মরণ থাকতে পারে, 'হারাধনের দশটি ছেলে'র মধ্যে দু'টির মৃত্যু কিন্তু এই পতনজনিত দুর্ঘটনার কারণে।

বিষাক্ত পদার্থজনিত দুর্ঘটনাও খুব একটা কম ঘটে না। অজ্ঞতা বা অসতর্কতার ফলে খাদ্য-পানীয়ের সংগে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ খুব অসম্ভব নয় এই হঠকারী বয়ঃসন্ধির সময়ে। আজকাল ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাসের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলে পাশ্চাত্যদেশের মতো এদেশেও বিষাক্ত গ্যাসের বিষক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা বাড়ছে।

সবশেষে **সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনার** কথাও কিছু বলা দরকার। প্রতি-যোগিতামূলক খেলাধূলায় মরিয়া হয়ে কিশোর-সমাজ অনেক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। খেলার উত্তেজনায় খেলোয়াড়দের পরস্পর অনৈচ্ছিক বা ইচ্ছাপূর্বক

সংঘর্ষ অনেক মারাত্মক ঘটনাই ঘটায়। তাছাড়া আছে পরস্পর মারদাংগার কথা। আজকাল যুবসংঘর্ষের বা ছাত্রসংঘর্ষের ঘটনাগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অহিংস পন্থায় হয় না। পাড়ায় পাড়ায় বোমাবাজি বা ছোরাছুরি, ক্ষুর ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহারও খুব চালু হয়ে পড়েছে। আর, এই সব সহিংস সংঘর্ষের শিকার হয়ে পড়েছে প্রধানত বয়ঃসন্ধির কিশোররাই।

দুর্ঘটনা মাত্রেই দুর্ঘটনা—অর্থাৎ তার কোনো পূর্বাভাস নেই, তাই কোন সতর্কতাবিশেষই তা নিবারণে সক্ষম নয়। এমন ধারণা যারা পোষণ করেন, তাদের কাছে সওয়াল এই যে তাহলে দুর্ঘটনার সিংহভাগ এই অসতর্ক অনভিজ্ঞ অর্বাচীনদের ক্ষেত্রে বেশী ঘটছে কেন? আর স্বভাব-সাবধাণী ধীরস্থির কিশোরীদের ক্ষেত্রে কিশোরদের তুলনায় কম ঘটে কেন?—বিশ্বের সব সংখ্যাতত্ত্বই এই সাক্ষ্য দেবে যে বিশেষ করে মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলো বয়ঃসন্ধিকালেই ঘটে। সুতরাং এই সব দুর্ঘটনার সংগে অসাবধানতা, অনভিজ্ঞতা ও হঠকারিতা মিশে আছে তা সন্দেহাতীত। আর এটা তো ঠিকই যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই ধারণাটাই অনেকখানি সাবধানী ক'রে তুলতে পারে আমাদের। তাছাড়া সামান্য কিছু দুর্ঘটনা-নিবারক ব্যবস্থা বা উপদেশও অনেকটা কার্যকরী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোটর সাইকেল বা স্কুটার চালনাকালে হেলমেট পরিধান মৃত্যুহার হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে[১৩৮]। অবশ্য হঠকারী বয়ঃসন্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সতর্কতা অবলম্বন করতে উৎসাহী হবে না হয়তো, কিন্তু সক্রিয় আইন এই ব্যাপারে তাকে বাধ্য করতে পারে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণও তেমনি এক সামাজিক বিধির ব্যাপার। স্কুল-কলেজে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা বা বয়ঃসন্ধিকালে দুর্ঘটনা-প্রতিরোধক-শিক্ষা বা ফার্স্ট-এড ট্রেনিং এইসব দুর্ঘটনার মারাত্মকতা কমাতে পারে। তেমনি, ঘুড়ি ওড়ানো বা বাজী পোড়ানোর পরবের আগে থেকে যদি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে সক্রিয় সোচ্চার প্রচার জোরদার করা যায়, তারও তাৎপর্য কম হবে বলে মনে হয় না। আর 'সংঘর্ষ' সম্পর্কে নতুন করে আর কি বলবো। সজোর সামাজিক অসম্মতি ছাড়া এর প্রতিরোধ সম্ভব নয় কোনমতেই।

দুর্ঘটনাপ্রবণ বয়ঃসন্ধিকে তাই নিয়ন্ত্রণের দায় পড়ে স্বভাবতই এদের কাছাকাছি যারা আছেন, এদের ওপরে যারা প্রভাব বিস্তার করছেন, এদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে যারা সত্যিসত্যিই চিন্তিত, সেই অভিভাবক-শিক্ষক-চিকিৎসক-রাষ্ট্রনীতিকদের ওপরেই।

১৮

খেলাধুলায় বয়ঃসন্ধি

সাম্প্রতিককালে খেলাধূলা ও ব্যায়াম সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এর কারণ হিসাবে দেখা যায় স্কুল-কলেজে খেলাধূলোর সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। তাছাড়া রেডিও-টেলিভিসানে খেলার প্রচার এবং পত্র-পত্রিকায় খেলার পাতা ও খেলাধূলা সম্পর্কিত বিশেষ পত্রাদির মাধ্যমে খেলাধূলার প্রচার কিশোর জগতে এই ব্যাপারে উৎসাহ বর্ধনে সাহায্য করেছে।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাদের কাজ-কারবার, তাদের পক্ষে শারীরশিক্ষা, ব্যায়াম ও খেলাধূলা সম্পর্কে ধ্যানধারণা থাকা তাই অত্যাবশ্যকীয় এবং সেই সংগে প্রয়োজন ব্যায়াম সম্পর্কীয় শারীরবিদ্যা ও খাদ্যপুষ্টিবিধানের জ্ঞানও। অভিভাবক, শিক্ষক, এমনকি চিকিৎসকদেরও বাধ্যবাধকতা আছে বয়ঃসন্ধির বালক-বালিকাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়াম-নির্ঘণ্ট স্থির করার বিষয়ে। ভাবীকালের এক শক্ত সমর্থ প্রজন্ম সৃষ্টির জন্য, উপরন্তু উঠতি একজন খেলোয়াড় বা ব্যায়ামবিদ তৈরী করার স্বার্থে, শরীরচর্চার বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন। তার সংগে ব্যায়াম শিক্ষক, শারীরশিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের সংগে শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীর সেতুবন্ধন অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

কিন্তু বয়ঃসন্ধির বিকাশশীল দেহমনের তাগিদ মেটাতে আমাদের আয়োজন যে কতখানি, সেই আসল ছবির দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক—"স্কুল-কলেজের খেলাধূলার বহর বছরে একটা স্পোর্টস্, যেগুলি মোটামুটি রানিং ইভেন্টেই সীমাবদ্ধ। অংশগ্রহণকারীদেয় শতকরা সাতানব্বই জনই নিয়মিত অনুশীলন করে না—এ্যাথেলেটিক্‌সের আদি অক্ষর এদের কাছে অপরিচিত।···স্কুলে ইদানীং শারীরশিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে। কর্মকর্তারা অবশ্য নিয়ম চালু করে দিয়েই খালাস। মাঠ নেই, সরঞ্জাম নেই, নিধিরাম সর্দার বানানোর হাস্যকর প্রচেষ্টা।······প্রশিক্ষণ দেবে কে? নির্দিষ্ট পিরিয়ডে অনির্দিষ্ট কোন শিক্ষক প্রায়শই তাই 'রুমালচোর' খেলান।······আধপেটা খেয়ে সকাল থেকে স্কুল করে, শেষ পিরিয়ডে ছেলেদের খেলার শক্তিই বা

আসবে কোত্থেকে ? তাই বাধ্যতামূলক শারীরশিক্ষা পরীক্ষায় বই দেখে যে যত পারে খেলার বিবরণ লেখে, ছবি আটকায়। নমঃ নমঃ করে স্কুলের শারীরশিক্ষার বাধ্যতামূলক গণ্ডীও পার হয়ে যায়। স্কুলের থেকে কলেজ তো আরও বিভীষিকাময়। কলেজে মাঠের বদলে ছোটখাট কমনরুম হয়তো আছে—তাতে ইনডোর খেলার সরঞ্জাম নেই। তাই দুয়েকটা ক্যারামবোর্ড বা অফ-পিরিয়ডে ধূমপান, সিনেমার গপ্পোই কলেজের খেলাধূলা"[১৩৯]। এই বাস্তব দুঃখের পরিচয় হয়তো অনেকেরই জানা—কিন্তু প্রতিকারের জন্য কে এগিয়ে আসবেন ?

যতদূর জানা গেছে, এ ব্যাপারে সরকারী প্রয়াস কিছুটা এগিয়ে এসেছে—পশ্চিমবংগ রাজ্য সরকারের কিছু প্রয়োগ-পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। শুধু সহরের নয়, গ্রামের ছেলেমেয়েরাও যাতে শরীরচর্চায় পটু হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে নজর রেখে বেশ কিছু অনুশীলনকেন্দ্র তৈরী হচ্ছে ; জেলায় জেলায় খেলার মাঠ তৈরী হচ্ছে ; নূতন খেলার মাঠ তৈরী বা পুরানো খেলার মাঠের সংস্কার-সাধনের জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করা হচ্ছে জেলা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে। এমন কি, প্রতি ব্লকে দু'হাজার টাকা মূল্যের খেলার সরঞ্জামও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাপক ক্রীড়া-প্রশিক্ষণের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের চিন্তাও হচ্ছে[১৪০]।

সরকারের বৃহত্তর পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, লবণ হ্রদে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় শাখা গড়ে তোলা, যেখানে তৈরী হবে ভারতের সবচেয়ে বড় ষ্টেডিয়াম, যাতে এক লক্ষ পনের হাজার ক্রীড়ানুরাগী দর্শকের স্থানসংকুলান হতে পারবে। জেলাভিত্তিক ষ্টেডিয়াম তৈরীর পরিকল্পনাও রয়েছে। ব্লক-ভিত্তিক জিমন্যাসিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্তও বহাল[১৪০]। তবে কথা হচ্ছে এই যে, সরকার তো অনুদান মঞ্জুর করেই খালাস ; সেই সরকারী শুভেচ্ছাগুলোকে রূপদান করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই বেসরকারী ক্রীড়ানুরাগী ছাত্র-যুবা-প্রশিক্ষক সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার। তারা যথাযথ অগ্রসর হয়ে এলেই বয়ঃসন্ধিকালের ক্রীড়ানুরাগকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হবে।

বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভভাগেই দেহের বৃদ্ধিবিকাশ আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগেই শারীরিক ক্রিয়াকাণ্ডের তাগিদও বাড়ে আর শারীরিক ক্রিয়াকাণ্ডের মুখ্য অভিব্যক্তিই হ'ল ব্যায়াম। এই শারীরক্রিয়ার মাঝে স্কুলে বা বাড়ীতে বা খেলার মাঠে কোন না কোন দৈহিক আঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং তার জন্য

প্রাথমিক চিকিৎসা বা বড় চিকিৎসার যে দরকার হবে তার জন্যও বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে বালিকা ও কিশোরীদের অংশগ্রহণের পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে। মেয়েরাও ছেলেদের মতই দৈহিক ক্রিয়াকর্মে ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করুক—এই মতের পরিপোষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, মেয়েরাও আজ ছেলেদের মতই অধ্যবসায়-সাধ্য শারীরক্রিয়ায় ব্রতী হচ্ছে। যে সব খেলায় ততটা দেহ-সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই, সেই সব খেলা মেয়েদের স্কুলেও তালিকাভুক্ত হচ্ছে। আর, মেয়েরা যেহেতু বয়ঃসন্ধির প্রথমাংশে ছেলেদের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি-বিকাশ লাভ করে, সেই হেতু তারা ঐসময়ে সমবয়সী ছেলেদের থেকে বেশী দক্ষ হয়। অবশ্য ছেলেরা শীঘ্রই তাদের ধরে ফেলে এবং পরবর্তীকালে তারা মেয়েদের চেয়ে অধিকতর দৈহিক দক্ষতা প্রদর্শন করতেও সমর্থ হয়। যে সব খেলায় দেহসংঘর্ষের আধিক্য রয়েছে, সেই সব খেলায় আঘাতের সম্ভাবনাও প্রবল। এই ঝুঁকি সামলাতে পারলে মেয়েরাও ছেলেদের সমানই শারীরিক দক্ষতা ও সামর্থ্য প্রদর্শনে পারদর্শী হতে পারে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে [১৪১] কিশোরীদের রজঃস্রাব, সন্তানধারণক্ষমতা বা গর্ভাবস্থার ওপর শ্রমসাধ্য ব্যায়াম কোনো বিপদের সৃষ্টি করে না। রজস্বলা হলে ব্যায়ামক্রিয়ার ওপরে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, এই ধারণাটাই অমূলক। শুধুমাত্র ঋতুকালে ক্লেশকর খেলাধূলা বা ব্যায়াম বন্ধ রাখলেই যথেষ্ট।

সবরকম ব্যায়ামের জন্যই শক্তি, সহনশীলতা, গতি, সমন্বয় ইত্যাদির প্রয়োজন সমান নয়। বিশেষ বিশেষ ব্যায়ামের জন্য বিশেষ বিশেষ যোগ্যতারও দরকার হয়। সুতরাং কিশোর-কিশোরীদের প্রবণতা, দক্ষতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যায়ামের বিভিন্ন বিভাগের জন্য তাদের নির্বাচন করার আন্তরিক চেষ্টা থাকা উচিত।

শারীরিক প্রয়োজনানুসারে American Medical Association Committe on Medical Aspects of Sports শরীরচর্চাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) দৈহিক সংঘর্ষ-সম্ভব ব্যায়াম, যথা, ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, রাগবি, কুস্তি ইত্যাদি ; (২) সহনশীলতাসম্পন্ন সংঘর্ষ-বিহীন ব্যায়াম, যথা দৌড়, সাঁতার, টেনিস, ভলিবল, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি ; এবং (৩) বিরামকালীন ব্যায়াম, যথা, গলফ, তীরন্দাজী, অসিক্রীড়া ইত্যাদি।

এখন দেখা দরকার যে বয়ঃসন্ধিকালে কোনজনের পক্ষে কোনটা উপযোগী হবে।

একই বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শারীরিক পরিণতির হেরফের ঘটেই। জীবনের দ্বিতীয় দশকে উৎপন্ন যৌনরসের প্রভাবে অস্থিগঠনের পূর্ণতা, পেশীর শক্তিবৃদ্ধি ও সমন্বয় ইত্যাদির সাহায্যে দেহের বাড়ের সংগে সংগে দেহের কর্মশক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কৈশোরের শরীরচর্চার জন্য তার দৈহিক বিকাশের সংগে জড়িত স্বাস্থ্য-মূল্যাবধারণ অবশ্য কর্তব্য। একারণে প্রথমত বিবেচনা করতে হয় খেলাধূলায় অংশগ্রহণকারীর বয়স ও তদনুযায়ী উচ্চতা ও ওজন। তবে সেই সংগে খেলার শ্রেণী অনুসারে দৈহিক পরিণতির বিচারও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, বিশেষ করে যে সব খেলায় দৈহিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় গ্রুপ ভাগ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা দরকার যে সমবয়সী হলেও শারীরিক যোগ্যতায় অসম হলে প্রতিযোগীরা যেন এক গ্রুপে না পড়ে। সমবয়সীদের মধ্যে এই রকম যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারণের বিপদও আছে। কেননা, বয়ঃসন্ধির স্পর্শকাতর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, যদি সমবয়সীদের সংগে সমান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধা আসে। সুতরাং খুব পুংখানুপুংখ পরীক্ষা ও বিবেচনার পর এই রকম বাছাবাছি করা দরকার।

সব প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াতেই কতকগুলি বিকলতা ও ব্যাধি অযোগ্যতার কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এগুলি হ'ল—সংক্রামক রোগ, হৃদরোগ, মূত্রতন্ত্রের রোগ, দীর্ঘস্থায়ী যকৃতের গোলমাল, রক্তদোষ, মধুমেহ, মৃগী ইত্যাদি। এসব রোগ যে কোন ব্যায়ামের পক্ষেই অনুপযোগী। কতকগুলি অসুস্থতা আবার শ্রমসাধ্য, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক, ক্রীড়ার সময়ে বেড়ে যেতে পারে—যেমন, লক্ষণবিহীন হৃদদৌর্বল্য, অনুগ্র উচ্চরক্তচাপ, অস্থিপেশীর বৈকল্য, মূত্রে প্রোটিন নিঃসরণ ইত্যাদি। এই সব গূঢ় রোগগুলিরও যথার্থ মূল্যায়ন করা দরকার। যেসব কিশোর-কিশোরীর যুগ্মযন্ত্রের, অর্থাৎ চোখ, কান, ফুসফুস, বৃক্ক, যৌন-গ্রন্থি ইত্যাদির, একটি আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কোনো সংঘর্ষ-সম্ভব ব্যায়ামে অংশ গ্রহণ না করাই উচিত। কারণ, বাকী সুস্থ যন্ত্রটিতে আঘাত লাগলে সেই যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে—হয়তো জীবনও বিপন্ন হবে।

খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ব্যাপারে অবৈজ্ঞানিক ভ্রমাত্মক ধারণার ফলে অনেক খেলোয়াড় ভালো খেলার তাগিদে জিলেটিন, ভিটামিন ও বহু তথাকথিত 'স্বাস্থ্যপ্রদায়ক' ঔষধ সেবন করে থাকে। কিন্তু এগুলির ফল ভাল না হোক, খারাপ হতে বাধা নেই। অনেকের বিশ্বাস, কঠিন পরিশ্রমের দাবী মেটানোর জন্য প্রোটিন বেশী খাওয়া দরকার। কিন্তু শারীরতাত্ত্বিক মতে দেখতে গেলে, পেশীশক্তির প্রাথমিক উৎস কিন্তু প্রোটিন নয়—প্রধানত শর্করা-জাতীয় খাদ্য ও আংশিকভাবে চর্বিজাতীয় খাদ্যই মূলত শক্তি (energy) উৎপাদন করে। আবার অনেকের বিশ্বাস যে ভিটামিন ও খনিজ লবণ খেলোয়াড়দের অনুশীলনকালে বেশী করে খাওয়া দরকার উন্নতস্তরের ক্রীড়া-কৌশল আয়ত্ত করার জন্য। কিন্তু, বহুলপরিমাণে ভিটামিন এ ও ডি'র এলোমেলো ব্যবহারে বিষাক্ত ফলাফল দেখা গেছে। সাধারণ সুষম খাদ্যেই যথেষ্ট ভিটামিন ও লবণ বর্তমান। খনিজ উপাদানের মধ্যে সোডিয়াম ও পটাসিয়ামই কঠিন শারীরক্রিয়ায় ক্ষয়িত হয়, যার পূরণ করা সম্ভব খনিজ লবণ-সমন্বিত পানীয় গ্রহণ করে অথবা লবণাক্ত খাদ্য বা ফল খেয়ে। শারীরক্রিয়ার ফলে ছয় পাঁইটের বেশী জল শরীর থেকে বেরিয়ে না গেলে আলাদা লবণ গ্রহণের প্রয়োজনই পড়ে না। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে অল্পপরিমাণে জল পান করা চলতে পারে। ক্রীড়াপ্রদর্শনের পূর্বেই খেলোয়াড়দের শরীরে যথেষ্ট জল থাকা প্রয়োজন, কেননা শরীরে জল কমে গেলে, তার যথাযথ পূরণ না হলে, সহজেই ক্লান্তি, সীমিত কর্মক্ষমতা, দেহতাপের বৃদ্ধি, এমন কি হীটষ্ট্রোকও ঘটতে পারে।

আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, ওজন কমাবার ব্যাপারটি, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে যা খুব ক্ষতিকর। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় ওজন কমাবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া কিশোররা করে থাকে। কিন্তু এই বয়সে এমন কিছু সঞ্চিত চর্বি থাকে না যে তার ক্যালোরীর চাহিদা মেটাতে পারে। সুতরাং এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত অপচেষ্টায় পরিণত হয়।

তাছাড়া, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আগে কেউ কেউ উত্তেজক বা প্রশান্তি-প্রদায়ক ঔষধ, এমনকি পুংযৌনরস সমন্বিত ঔষধ, ব্যবহার করে থাকে। এগুলো ভাল করুক বা না করুক, দেহমনের পক্ষে ক্ষতিকারক ফল দেয়—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উপরন্তু খেলোয়াড়দের পক্ষে 'ঔষধগ্রহণ'

তাদের নৈতিক ও খেলোয়াড়ী মনোভাবের সংগে সংগতিহীন[১৪২]। এই ধরণের ঔষধ-প্রয়োগ বা 'ডোপিং'-এর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সম্বন্ধে এক সাংবাদিক প্রতিবেদন[১৪৩] বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"কলকাতায় খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তেজক ঔষধ ব্যবহারের (ডোপ) প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে এবং এ নিয়ে বিভিন্ন মহল বিশেষ করে চিকিৎসকরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কলকাতার খেলোয়াড়রা শুধু ট্যাবলেটই খায় না, খেলার আগে উত্তেজক ইনজেকশনও নেয়। অনেকের কাছে এটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন চিকিৎসক বলেছেন, উত্তেজক ওষুধ বেশী খেলে বা ইনজেকশন নিলে নানা রোগ দেখা দিতে পারে। এইসব ওষুধ সবচেয়ে ক্ষতি করে হারটের। মেয়েদের মাতৃত্ব নষ্ট করে দেয়, এমন কি পুরুষেও রূপান্তরিত হতে পারে। একসংগে বেশী ট্যাবলেটে খেলে বা বেশী ইনজেকশন নিলে মৃত্যুও হতে পারে।...একজন চিকিৎসক অভিযোগ করলেন, অন্যান্য রাজ্যে ভারোত্তোলক ও হকি খেলোয়াড়দের মধ্যেও উত্তেজক ওষুধ খাওয়ার নজীর রয়েছে।...বেশ কিছু ফুটবলার ও এ্যাথলিট মুড়িমুড়কীর মত ডোপ খাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক দেখেছেন, এতে মাসল ক্র্যাম্পও হচ্ছে। তিনি এর বিষময় ফল জানিয়ে নিষেধ করলেও ওই খেলোয়াড় ছেলেমেয়েরা তার কথা গ্রাহ্য করেনি। চিকিৎসকরা বিস্মিত হয়েছেন কয়েকজন কোচের কথা শুনে। তাঁরাই নাকি ডোপ ব্যবহারের জন্য ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করেন কৃত্রিম উপায়ে সাময়িক-ভাবে ওদের নৈপুণ্য বজায় রাখতে। অথচ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ডোপ করা বে-আইনী। ওলিমপিকস বা এশিয়ান গেমসে পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয় ডোপ খেয়ে কেউ পদক জিতেছে তার পদক কেড়ে নেওয়া হয়।...ভারতে এতদিন ডোপ টেসটের ব্যবস্থা ছিল না।... ফেবরুয়ারীতে বাঙ্গালোরে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় হবে প্রথম ডোপ টেসট।" এরপরে খেলাধূলায় ব্রতী বয়ঃসন্ধির সাবধানতা সম্বন্ধে আর কিছু বলা বাহুল্যমাত্র।

১৭

বয়ঃসন্ধির বৃত্তিভাবনা

বয়ঃসন্ধির দুই প্রান্তে অর্থার্জনে কর্মবিনিয়োগ সমাজের পক্ষে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের দ্বিতীয় দশকের প্রথম ভাগে অর্থাৎ শৈশবধর্মী কৈশোরে অর্থনৈতিক কারণে কর্মনিযুক্তি ঐ বয়সের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু আর্থিক দিক থেকে লাভজনক বলে বিভিন্ন দিকে তাদের নিযুক্তি ঘটে চলেছে। উল্টোদিকে, জীবনের দ্বিতীয় দশকের শেষ প্রান্তে যুবশক্তির প্রচণ্ড প্রয়োজন কোনো না কোনো কর্মে নিযুক্ত থাকা, অথচ তখন ভয়াবহ বেকারীর সমস্যা তাকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করে তুলছে। সামাজিক দিক থেকে তাই দুটো সমস্যাই বিশেষ জরুরী।

শিশু-কিশোর শ্রমজীবী সমস্যা

অনেক সমাজসমীক্ষকের ধারণায় ভারতীয় শিশুরা নাকি শৈশবের সংজ্ঞায় পড়ার সুযোগই পায় না, কারণ তাদের অনেককেই কাঁথা ছেড়েই কাজের চাকায় জুড়ে যেতে হয়। অজ্ঞানতা আর দারিদ্র্যজনিত পারিবারিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা উপার্জনে নিয়োজিত হয়[১৪৪]। অভিভাবকরা প্রায়শই এই সব অল্পবয়সীদের কাজে নিযুক্ত করার অন্তর্নিহিত বিপদ সম্পর্কে উপেক্ষা করে থাকেন অনেকটা দায়ে পড়েই।

ভারতীয় আইনে[২৪] চৌদ্দ বছরের কমবয়সী কাউকে কোনো ক্লেশকর কাজে নিয়োজিত করায় নিষেধ আছে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থাও পনের বছরকেই কর্মক্ষম বয়সের নিম্নসীমা নির্ধারিত করেছেন এবং পনের থেকে সতের বছর বয়সী শ্রমিকের নৈশ খাটুনী সম্পর্কেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন[১৪৫]।

অথচ ১৯৭১ সালের লোকগণনায় প্রকাশ যে প্রায় ৭'৪ শতাংশ চতুর্দশ-অনধিক বালকবালিকা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন বিপজ্জনক কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিয়োজিত হচ্ছে। দেখা গেছে যে কমবয়সী কিশোর-কিশোরীরা তাদের বয়সের অনুপযোগী শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

পাটীগণিতের সেই 'শ্রম ও মজুরী'র অংক স্মরণ করুন—প্রাপ্তবয়স্কের অর্ধেক মজুরী দিতে হয় বালক মজুরকে এবং এই অংকের ভেতর দিয়েই সামাজিক মানসিকতা প্রতিফলিত। তাই দেখি, "আজও গ্রামাঞ্চলের শিশুদের শতকরা ৯৩ জন কাজ করে পারিবারিক জোত বা অন্যের জমিতে। এছাড়া ক্ষুদ্র রসায়নশিল্প, অধাতব খনিজশিল্প, তামাকশিল্পগুলিতে এদের সংখ্যা প্রচুর। ক্ষুদ্র উৎপাদনভিত্তিক দেশলাইশিল্প বহুলাংশে শিশুশ্রমিক নির্ভর। ঠিক এমনটিই ঘটেছে দক্ষিণ ভারতের কাজুবাদামশিল্পে, বিড়িশিল্পে, তাঁতশিল্পে, ট্যানিং, ছাপাখানা, পটারী, কাঁচ, বেকারি প্রভৃতি কুটীরশিল্পগুলিতে। চা-বাগিচা এবং অভ্রখনিতে শিশুশ্রমিক নিয়োগের হার রীতিমত উদ্বেগজনক। মুর্শিদাবাদের বিড়িশিল্পে শতকরা ২৫ জন শিশুশ্রমিক। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে তাঁত-শ্রমিকের প্রতি ৪ জনের ২ জনের বয়স দশ থেকে বার বছরের মধ্যে। উত্তর-প্রদেশের ফিরোজাবাদে কাঁচের চুড়িশিল্পে শতকরা ২০ জন শিশুশ্রমিক।"[১৪৪] তামিলনাড়ুর রামনাথপুরমে দেশলাই কারখানায় বা শিবকাশীতে আতসবাজী শিল্পেও নাদার বালকরা নিয়োজিত হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে স্লেট তৈরীর কাজে নিযুক্ত হচ্ছে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা[১৪৬]। কিশোর গৃহভৃত্য বা ক্যান্টিনবয়কে বেশ ভালরকমই খাটতে হয়, অথচ পারিশ্রমিক তারা কম পেয়ে থাকে বয়স্কদের তুলনায়। প্লাষ্টিক জিনিষের কারখানায় শিশুকিশোর শ্রমিকের কদর বেশী। এছাড়া মিউনিসিপালিটির পিটবয় হিসাবে, এমনকি খনির কাজেও, কমবয়সী কিশোরদের কাজে নিযুক্ত করা হয়, যদিও এই সব কাজে স্বাস্থ্য বিপুলভাবে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা প্রবল।

অসম্ভব কাজের চাপ শিশু ও কিশোরদের বৃদ্ধিবিকাশ, পুষ্টিবিধান ও শিক্ষা-ক্রমের পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া এই সব অল্পবয়সীরা মানসিক দিক থেকে অপরিণত, অনভিজ্ঞ ও ব্যক্তিগত রক্ষণজ্ঞানহীন হওয়ার ফলে প্রায়শই দুর্ঘটনা-জনিত আঘাতের শিকার হয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনীতিবিদরা তাই ভাবুন, কি উপায়ে বয়ঃসন্ধির পূর্ব-প্রান্তীয় এই সব শিশু-কিশোরদের এইসব বেআইনী ক্ষতিকর বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করা যায়। যার শুধুমাত্র লেখাপড়া ও খেলাধূলার আনন্দে মেতে থাকার কথা, তাকে উপার্জনের যন্ত্র বানানোর এই সামাজিক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার করার উপায় তো ভেবে বার করতেই হবে।

যুবসমাজে বেকার সমস্যা

যুবশক্তি সমাজের প্রধান সৃজনশীল অংশ। কিন্তু দুঃসহ কর্মহীনতার ভয়াবহ যন্ত্রণা এই অংশের শক্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আর এই বেকারত্ব সারা ভারত জুড়েই আজকের যুগে ক্রমবর্ধমান।

১৯৭৬-এর মার্চে বেকারের সংখ্যা ছিল ৯৩·৫৩ লক্ষ, ১৯৭৭-এর মার্চে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০২·৯৩ লক্ষে, এবং এই বেকার সংখ্যার ৬০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে পনের থেকে চব্বিশ বছরের তরুণ-তরুণীদের দল[১৪৭]। উক্ত সমীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরের শেষে চৌদ্দ বছরের কমবয়সী কর্মপ্রার্থী ২২,৩০০ ও কর্মপ্রার্থিনী ২,২০০ এবং পনের থেকে উনিশ বছর বয়সী বেকার ছেলের সংখ্যা ২৬,১৯,৮০০ ও মেয়ের সংখ্যা ২,৫৬,০০০ অর্থাৎ উনিশ বছর পর্যন্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দেশের মোট কর্মপ্রার্থীসংখ্যার প্রায় ৫৬·৫ শতাংশ[১৪৭]। ১৯৭২-এর ডিসেম্বরের শেষে কিন্তু এই সংখ্যা ছিল ৪২·৫ শতাংশ। তখন উনিশ বছরের নীচে বেকার ছেলের সংখ্যা ছিল ১৪,৭৪,৩০০ আর বেকার মেয়ের সংখ্যা ছিল ১,৬২,১০০ জন[১৪৮]। পশ্চিমবংগের নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের এক বিবরণীতে[১৪৯] দেখা যাচ্ছে—১৯৭৭ সালের মার্চে যে সংখ্যা ছিল ১২,৩১,৯০০, জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২,৬৯,২০০-তে। তার মানে তিন মাসে বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে ৩৭,৩০০। আর, ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬,২৪,৫০০-তে। এই কর্মসন্ধানীদের ২২·৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬,৯০,৫০০ উনিশ বছরের কমবয়সী[১৫০]। এই সংখ্যাতত্ত্ব কিন্তু শুধুমাত্র নথিভুক্ত কর্মার্থীদের। এর বাইরে যে বেকার সংখ্যা সমাজের বুক জুড়ে রয়েছে তা গোনা হয়নি, তেমনি গোনা হয়নি অর্ধ-বেকার ও সাময়িক বেকারদেরও। সুতরাং ক্রমবর্ধমান এই বেকারসমস্যার ভয়াবহতা যেমন রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্বকে ভাবিয়ে তুলছে, তেমনি উত্তাল করেছে বয়ঃসন্ধির আবেগপ্রবণ স্পন্দনশীল সত্তাকেও।

বেকারত্বের বৃদ্ধিহারের সংগে তাল রেখে কিন্তু কর্ম-বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটছে না। সরকারী হিসাবেই[১৪৭] দেখা যাচ্ছে—কর্মসন্ধানীর বাৎসরিক সংখ্যা যখন বাড়ছে ৯·৪ শতাংশ হারে, কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটছে ২·৫ শতাংশ হারে। এবং বছর বছর কর্মসন্ধানী ও কর্মসংস্থানের এই ব্যবধান বেড়েই চলেছে—বেড়েই চলেছে। যোজনা কমিশনও এই সমস্যা নিয়ে বহুবার ভেবেছেন এবং ভেবেই চলেছেন।

বহুদিক থেকে তাই বয়ঃসন্ধির উত্তরপ্রান্তে উপনীত দেশের যুবসমাজ সোচ্চার হয়েছে কর্মসংস্থানকে সাংবিধানিক মৌল অধিকারভুক্ত হিসাবে ঘোষিত করার জন্যে। উন্নত দেশগুলিতে আজ 'কাজের অধিকার' মৌল অধিকার হিসাবে স্বীকৃত নয় শুধু, কোনো কোনো দেশে পেশা বেছে নেবার ও নিজের পেশা ও পেশাগত দক্ষতা ইত্যাদির সাথে সংগতিপূর্ণ কাজ করার অধিকার সংযুক্ত হয়েছে[১৫১]। বর্তমান পৃথিবীর এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের যুবসমাজের কণ্ঠে তাই সেই সংগত দাবী সোচ্চার হয়েছে—"হয় কাজ দাও, নতুবা কাজ সাপেক্ষে বেকার ভাতা দাও।" ভারতেরই কোনো কোনো রাজ্যে অবশ্য চালু হয়েছে 'বেকার ভাতা'। কিন্তু এই বেকার-ভাতা কি মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে? কেননা, বেকারভাতা পেতে পারে বিশাল বেকার সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, তাছাড়া বেকার-ভাতায় তারুণ্যশক্তি তার জীবনের দুঃসহ কর্মবিহীনতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

কর্মবিহীনতা ও কর্মসংস্থানের বিরাট ব্যবধানের মধ্যেও বিনিয়োগ ব্যাপারে একটা সামঞ্জস্যমূলক নিয়ন্ত্রণ আনার প্রচেষ্টা হচ্ছে সরকারের শ্রমমন্ত্রক থেকে। দেশের কর্মপ্রার্থীদের নথিভুক্ত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে কর্মসংস্থান কেন্দ্র-গুলিতে। যে সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যুদ্ধফেরত সেনাদের নাগরিকজীবনে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে এবং পরবর্তীকালে ভারতভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনকল্পে, সেই সংস্থা শিবরাও কমিটি (১৯৫২)-র সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৬ সালের নভেম্বরে 'কর্মবিনিয়োগ সংস্থা' হিসাবে রূপান্তরিত হ'ল এবং বিনিয়োগ-ভাবনা নিয়ে পরিসংখ্যান, গবেষণা ও পেশাগত উপদেশ দানের কর্তৃপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো[১৫২]।

জাতীয় কর্মসংস্থান সংস্থাগুলি তাই যেমন একাধারে কর্মসন্ধানীদের বয়স-লিংগ-শিক্ষা-যোগ্যতা ইত্যাদি নথিবদ্ধ করে চলেছে, তেমনি আবার কর্ম-বিনিয়োগের বাজারের সন্ধান-সংগ্রহ ক'রে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্ম-বিনিয়োগের সম্ভাবনাও নথিবদ্ধ করছে। সরকারী চাকরী কেবলমাত্র কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্র মারফৎ দেওয়া হবে—এমন নীতিও গ্রহণ করছেন সরকারী কর্মকর্তারা। বেসরকারী বিনিয়োগগুলিও যাতে এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে হয় তার জন্যও প্রচণ্ড দাবী উঠেছে।

তাছাড়া, শুধুমাত্র চাকরীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশের যুবসমাজ যাতে

স্ব-বিনিয়োগে উৎসাহিত হতে পারে, তার জন্য অন্তত পশ্চিমবংগের কর্মসংস্থান অধিকারের প্রযোজনায় যুবজনের জন্য পেশাগত উপদেশ (VGYP) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে নিয়মিতভাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা 'কেরিয়ার ষ্টাডি সেণ্টার' থেকেও নিয়মিতভাবে কর্মসন্ধানীদের বিভিন্ন পেশায় কর্মসংস্থানের নিমিত্ত গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব বিতরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে[১৫৩]।

মোট কথা, জাতীয় কর্মসংস্থান সংস্থার বিনিয়োগ-ভাবনার বলিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রয়োগ ঘটলে বয়ঃসন্ধির কর্মবিহীনতার যন্ত্রণা হয়তো অনেকখানি প্রশমিত হতে পারে। উপরন্তু এই উন্নয়নশীল দেশে শুধুমাত্র চাকরী-নির্ভরতা না রেখে স্ববিনিয়োগের দিকে ঝোঁক বাড়লেও দেশের তারুণ্যশক্তি তার স্বভাবজ কর্মচাঞ্চল্যের আবেগের নিরাকরণের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারেও চাই রাষ্ট্রীয় কর্ণধারবর্গের সুষ্ঠু অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা—নতুবা স্ববিনিয়োগের প্রেরণাও মার খেতে বাধ্য সার্বিক রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার যথার্থ সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগ-ভাবনা ব্যতিরেকে।

২০

বয়ঃসন্ধিকালীন প্রযত্ন

বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য-প্রযত্ন

প্রযত্ন ব্যাপারে প্রথমেই ধরতে হবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রযত্নকে। কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বয়ঃসন্ধিকালীন প্রযত্নের বিশেষ সহায়ক। সংখ্যার দিক থেকে তরুণদের যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধান সন্তোষজনক তো নয়ই, এমনকি এই বয়সে ঘটা অসুস্থতা, রোগ ও পুষ্টিদশা নিয়ে হিসাব-নিকাশও তেমন যথেষ্ট হয় নি।

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপ্রযত্ন আবশ্যিক হয়েছে। সাম্প্রতিককালে স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমোদপ্রমোদ ও শারীরিক শিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি ঘটেছে। বহু স্কুলে সস্তা দরে বা বিনা-মূল্যে দ্বিপ্রাহরিক পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে—যদিও সাংগঠনিক দুর্বলতায় এ বন্দোবস্ত তেমন পূর্ণাংগ হয়ে উঠতে পারেনি।

তাছাড়া স্বাস্থ্যশিক্ষাও কিশোরকিশোরীদের বাড়ন্ত দেহমনের বিকাশে সাহায্য করতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালীন সকল বয়সের জন্য নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য-শিক্ষাক্রম থাকলে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার সুন্দর সুযোগ মিলতে পারে।

পল্লীগ্রামেই কিশোর সংখ্যার আশী শতাংশের বাস। কিন্তু সেখানেই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যপ্রযত্ন ও স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা খুবই অপ্রচুর। বহু জায়গায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে করা হয় না পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত বারে বারে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হলে এবং তাদের শারীরিক-মানসিক অগ্রগতির ধারা নথিবদ্ধ করা থাকলে, যে কোনো সাময়িক বৈকল্যই সহজে ধরা পড়তো ও তার প্রতিবিধান সম্ভব হতো।

আমাদের হাসপাতালগুলোতে শরীরের তন্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে, কিন্তু এই বিশেষ বয়সের কথা চিন্তা করে কোনো বিশেষ বিভাগ খোলা হয়নি। হাসপাতালে 'শিশু বিভাগ' আছে, কিন্তু নেই কোন 'কিশোর বিভাগ'।

যদিও প্রাপ্তবয়স্কদের রোগগুলো কৈশোরেও সম্ভব, কিন্তু একই রোগের প্রতিক্রিয়া দুই বয়সে সমান নয়। তাই কৈশোরকালীন রোগভোগের চিকিৎসা ও প্রযত্ন আদর্শ ও সফল হওয়া নির্ভর করে চিকিৎসকের উদ্দীপনা, আবেগপ্রবণতা ও ব্যক্তিত্ব এবং সেই সংগে তাঁর বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের জন্যে সময় ও শক্তি খরচা করার ইচ্ছার উপর। কারণ, বয়ঃসন্ধিকালীন রোগীর মূল্যায়ন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ কাজ। এ ব্যাপারে প্রয়োজন পড়ে, রোগীর দৈহিক বৃদ্ধি-বিকাশের অনুধাবন থেকে শুরু করে পারিবারিক সম্পর্ক ও সমবয়সীদের সংগে খাপখাওয়ানোর খবর পর্যন্ত। যদিও অর্থ নৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত কিশোরদের স্বাস্থ্যপ্রযত্নের ধারা সচ্ছল সমাজের কিশোরদের থেকে তেমন হেরফের হয় না, তবুও বয়ঃসন্ধিকালে স্বাস্থ্যবিধানকল্পে আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নও বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের হাসপাতালগুলোর অধিকাংশ বহির্বিভাগ এমনই জনবহুল হয়ে পড়েছে যে বয়ঃসন্ধির কিশোর-কিশোরীরা স্বভাবতই তাদের লাজুকতাবশত ঐসব জায়গায় যেতে সংকুচিত ও ভীত হয়ে পড়ে। তারা তাদের অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে বরং খানিকটা উদাসীন হয়ে যায়। তাছাড়া অসুখ-বিসুখের বিবরণ দেওয়ার সময়ে কিশোর-কিশোরীরা সাধারণত অস্পষ্ট বিবরণ দেয়। তারা হয় ঘাবড়িয়ে যায়, নয়তো বড়দের ভীড়ের মধ্যে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। এইসব বিবেচনা করে মনে হয়, শুধুমাত্র কিশোর-কিশোরীদের জন্যে নির্দিষ্ট চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকলে এই সব লাজুক ও অনীহাসম্পন্ন কিশোর-বয়সীদের খুব সুবিধা হ'ত, এবং তাহলেই যথার্থ বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য-প্রযত্ন নেওয়া যেত[১৫৪]।

বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টি-প্রযত্ন

বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যপ্রযত্নে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থার সংগে পুষ্টি-ব্যবস্থাও জোরদার করতে হবে। এই বয়সের বিপাক-ক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের বিপাক-ক্রিয়ার ধরনেই হয়। যেটুকু তফাৎ তা হ'ল, বৃদ্ধি-বিকাশের ত্বরিৎগতির জন্য এই সময়ে হয় দেহে নাইট্রোজেন অধিগ্রহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষের প্রাধান্য। নবজাত প্রোটিন যেমন অস্থি-পেশী ও দেহযন্ত্রাদির গঠনে অংশ গ্রহণ করে, তেমনি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অন্তঃরস সংশ্লেষের বয়ঃসন্ধিকালীন বর্ধমান দাবীও মেটায়। তাছাড়া শারীরিক ক্রিয়াকলাপও বাড়ে তারুণ্যের

উচ্ছলতায়, তাই ক্যালোরী-প্রদায়ক খাদ্যের দাবীও বাড়ে বয়ঃসন্ধির শরীরে। পুষ্টি-প্রযত্ন তাই এই বয়সে অবশ্য-কর্তব্য।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে যুদ্ধোত্তর কালে শিশু ও কিশোরেরা বেশী লম্বা ও অধিকতর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এক বিবরণে[১৫৫] প্রকাশ যে যুদ্ধোত্তরকালে জাপানের ত্রয়োদশবর্ষীয় কিশোর যুদ্ধপূর্বকালের সমবয়সী কিশোরের তুলনায় লম্বায় তিন ইঞ্চি বেশী। ইলিংওয়ার্থের[১১৯] ধারণা, পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ তার সর্বোচ্চ উচ্চতা লাভ করতো ছাব্বিশ বছর বয়সে, এখন উনিশ বছরেই পৌঁছে যাচ্ছে ঐ সর্বোচ্চ উচ্চতায়। এই সব ঘটনা প্রতিপন্ন করে যে, বর্তমানের বাপমায়েরা তাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন। সম্পন্ন সচ্ছল পরিবারের ছেলেদের সাধারণত বেশী লম্বা ও স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ হতে দেখা যায়, সম্ভবত তাদের জন্য যথাযথ পুষ্টিপ্রযত্ন গ্রহণ করার ফলেই। সংগে সংগে এ-ও দেখা যায় যে বহু পিতামাতা ছোটদের পুষ্টিবিধান সম্পর্কে উদাসীন এবং বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টির বিশেষ দাবী সম্পর্কে জ্ঞানহীনও বটে।

স্বাস্থ্য-শিক্ষা-বিধানে খাদ্য ও পুষ্টির সমস্যা নির্ধারণ অত্যাবশ্যকীয়। বয়ঃসন্ধির বৃদ্ধি-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য অনুসন্ধানের জন্য ধারাবাহিক গবেষণা নিয়োজিত হওয়া উচিত স্থানীয় প্রাপ্তি-সুযোগ অনুযায়ী অন্বেষণ করার মাধ্যমে। তাহলে হয়তো পরিমিত খরচের মধ্যে যথার্থ পুষ্টি-পরিকল্পনা সম্ভব হতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের বৃদ্ধির হারের সংগে তাল রেখে বর্ধিত ক্যালোরী সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপরন্তু এই সময়ে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্যালোরীর চাহিদা আরো বাড়ে। কিশোরীদের ক্ষেত্রে রজোপ্রবৃত্তির সময়ে তাদের সর্বোচ্চ বৃদ্ধিহারের সংগে সমতালে ক্যালোরীর প্রয়োজনও সর্বোচ্চ হয়। আবার, বয়ঃসন্ধিকালে সব থেকে বেশী ক্যালোরী ব্যবহারের পরে, বয়োবৃদ্ধির সংগে মানুষ যত প্রাপ্তবয়স্কতার দিকে এগোতে থাকে, ক্যালোরীর চাহিদাও তত ক্রমশ কমে যেতে থাকে। National Advisory Commitee of India (1958)-র হিসাব অনুসারে দশ থেকে বারো বছরের বালক-বালিকার প্রতিদিনের চাহিদা ২১০০ ক্যালোরী, তের থেকে পনের বছর বয়সী কিশোরের প্রয়োজন ২৫০০ ক্যালোরী এবং কিশোরীর প্রয়োজন ২১০০ ক্যালোরী। ষোল থেকে উনিশ বছর বয়সে কিশোরের দৈনিক ক্যালোরীর

চাহিদা বেড়ে হচ্ছে ৩১৫০, কিন্তু ঐ বয়সী কিশোরীর চাহিদা থেকে যাচ্ছে সেই ২১০০ ক্যালোরীতেই।

বয়ঃসন্ধির ক্যালোরী চাহিদা মেটাবার সময়ে প্রোটিন চাহিদার কথাটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। কেননা কৈশোরের বৃদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশের সংগে প্রোটিন চাহিদার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বয়ঃসন্ধির ঠিক প্রাক্কালে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে যায়, কারণ তখন দেহাভ্যন্তরে ধনাত্মক নাইট্রোজেন সাম্য ঘটতে থাকে। বয়ঃসন্ধির শেষভাগে এই প্রয়োজন ক্রমেই কমে আসে। প্রোটিন চাহিদা নির্ধারণে নিযুক্ত FAO-এর এক কমিটির বিবেচনায় জন্মসময়ে প্রোটিনের চাহিদা থাকে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ২ গ্রাম, দশ বছর বয়সে সেই চাহিদা কমে দাঁড়ায় ০'৮ গ্রামে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভে বৃদ্ধি-উৎক্ষেপকালে ঐ চাহিদা হয় কিলো প্রতি ১ গ্রাম এবং বয়স বাড়ার সংগে সংগে ঐ চাহিদা কমতে কমতে প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে দাঁড়ায় প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ০'৪ গ্রামে। পাশ্চাত্য দেশে এগার থেকে তের বছর বয়সে প্রোটিনেয় চাহিদা দৈনিক ৭৫ থেকে ৮০ গ্রাম। ভারতীয় কিশোর-কিশোরীদের উচ্চতা ও ওজনের মান পাশ্চাত্য মানের চেয়ে খাটো। তবে এর জন্য প্রোটিন খাদ্য গ্রহণের মাত্রা কতখানি দায়ী, সে কথা ঠিক বলা যায় না [১৫৬]।

কৈশোরের খাদ্য-তালিকা সম্পর্কে তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তা হয়েছে। গবেষকদল অনেক রকম তালিকা প্রস্তুত করেছেন। বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে প্রস্তুত এক খাদ্য তালিকায় [১৫৭] অনুমোদিত হয়েছে—প্রোটিন ১৪%, স্নেহ ২৬% ও শর্করা ৬০%—সবগুলো যোগ করলে যেন মোট ২৫৮৯ ক্যালোরী হয়। আর এই তালিকায় পরিমাণ হিসাবে খাদ্য যেন থাকে এই রকম—প্রোটিন ৮৮'৭ গ্রাম (যার মধ্যে প্রাণিজ প্রোটিন যেন অন্তত ২৯'৪ গ্রাম থাকে), স্নেহ ৭৫'৫ গ্রাম ও শর্করা ৩৮৮'৬ গ্রাম। তাছাড়া ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ও ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকাও দরকার।

The U. S. A Food and Nutrition Board, National Academy of Sciences (1968) বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন বয়স, উচ্চতা ও ওজন অনুসারে যে দৈনিক খাদ্য-তালিকা অনুমোদন করেছেন, তা আমাদের

দেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য আদর্শ খাদ্য-তালিকা প্রণয়নের নির্দেশিকা হিসাবে ধার্য হতে পারে—

	বয়স (বছর)	ওজন (কিঃগ্রা)	উচ্চতা (সেঃমি)	ক্যালোরী চাহিদা	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম]	লৌহ (মিঃগ্রা)	আয়োডিন (মাইক্রোগ্রাম)
কিশোর :	১০-১২	৩৫	১৪০	২৫০০	৪৫	১.২	১০	১২৫
	১২-১৪	৪৯	১৫১	৩১০০	৫০	১.৪	১৮	১৩৫
	১৪-১৮	৫৯	১৭০	৩১৬০	৬০	০.৮	১৮	১৫০
কিশোরী :	১০-১২	৩৫	১৪২	২১০০	৫০	১.২	১৮	১১০
	১২-১৪	৪৪	১৫৪	২৪০০	৫০	১.৩	১৮	১১৫
	১৪-১৬	৫২	১৫৭	২৬০০	৫৫	১.৩	১৮	১২০
	১৬-১৮	৫৪	১৬০	২৪০০	৫৫	১.৩	১৮	১১৫

লৌহের প্রয়োজনীয়তা রক্ত প্রস্তুত কার্যে। তাই লৌহের চাহিদা কিশোরীদের ক্ষেত্রে বেশী, কেননা ঋতুস্রাবে তাদের নিয়মিতভাবে রক্তক্ষরণ হয় বলে তা পূরণ করার জন্য নিয়মিতভাবে লৌহেরও প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া কিশোরী যখন গর্ভবতী হয়, তখনও লৌহের চাহিদা বাড়ে। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজনীয়তা প্রধানত অস্থিগঠনে। তাই অস্থির গঠন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে খাদ্যের মধ্যে এই ধাতব লবণের দরকার পড়ে সব থেকে বেশী এই বয়ঃসন্ধিকালেই।

অতিসরলীকরণের ফলে ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাকেই পুষ্টিবিধানের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু পুষ্টি বলতে ক্যালোরী অধিগ্রহণের অতিরিক্ত অনেক কিছুকেই বোঝায়। যেমন, প্রোটিন গ্রহণের ক্ষেত্রে দেহাভ্যন্তরে যেসব অ্যামিনো এসিড প্রস্তুত হয় না সেই সব অ্যামিনো-এসিড-সম্পন্ন প্রোটিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন যথাযথ বৃদ্ধির খাতিরে। প্রোটিনের অভাবে যৌনোদ্গমও বিলম্বিত হতে পারে বৃদ্ধি হ্রাসের সংগে সংগে। ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজনও তেমনি জরুরী।

পুষ্টি-প্রকল্পে খাদ্য-নির্ধারণ যেমন প্রয়োজনীয়, গৃহীত খাদ্য যথাযথ পরিপাক ও বিশোষণ হচ্ছে কিনা সেটা দেখাও জরুরী। হজমের গোলমাল বা পেটের রোগের কারণে যদি পুষ্টিকর আহার শরীরের কাজে না লাগে, তো পুষ্টি-প্রযত্নের ষোল আনাই মিছে। তাই এই বিষয়টাও নজরে রাখা উচিত পুষ্টি-প্রযত্নের অংগ হিসাবে।

যুবকল্যাণ প্রকল্প

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিপ্রযত্ন ছাড়াও বয়ঃসন্ধিকালীন তারুণ্য দেহমনের বাড়ার তাগিদে অন্যান্য অনেক সমস্যারই সমাধানের দাবী নিয়ে এসে হাজির হয়। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই দেশের মৌল সমস্যার সমাধান না করে বয়ঃসন্ধির নিজস্ব সমস্যার কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। সেই সংগে এটাও অনস্বীকার্য যে কিছু সুষ্ঠু বাস্তবানুগ পরিকল্পনা ও তৎপর উদ্যোগের সমন্বয়ে দেশের এই পরিপ্রেক্ষিতেই যুবমানসের সংকটের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতাকে আংশিক প্রশমিত করা সম্ভব। পশ্চিমবংগ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজে ব্রতী হতে দেখা যাচ্ছে।

১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে সরকারী 'যুবকল্যাণ দপ্তর'-এর সৃষ্টি। মাত্র সাতানব্বই হাজার টাকার অর্থবরাদ্দ নিয়ে এই দপ্তর কাজ শুরু করেছিল। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে এই বরাদ্দ দাঁড়ায় আট লক্ষ উনআশি হাজার টাকায়। ক্রমে ক্রমে অর্থবরাদ্দ বাড়তে বাড়তে ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে বরাদ্দ দাঁড়ায় একচলিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজারে। তারপরে সরকারের পালাবদল ঘটেছে, কিন্তু যুবকল্যাণের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বেড়েছে বই কমেনি। তাই দেখি, ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে যুবকল্যাণ খাতে বরাদ্দ হয়েছে এক কোটি তের লক্ষ সতের হাজার টাকা এবং ক্রমে ক্রমে তা বাড়তে বাড়তে ১৯৮১-৮২ সালের বরাদ্দে দাঁড়িয়েছে দু'কোটি আটষট্টি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ আর্থিক বছরের শুরুতে এই দপ্তরের কাজ শুরু হয়েছিল চল্লিশটি ব্লক নিয়ে। আজ এই একাশি সালের মার্চ মাসে দেখি পশ্চিমবংগের মোট তিনশ পঁয়ত্রিশটি ব্লকের মধ্যে তিনশ সাতাশটি ব্লকে যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগ প্রসারিত হয়েছে[১৫৮]।

সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের প্রকল্পগুলিকে[১৫৯] প্রধানত এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

(১) অর্থনীতিক

(ক) বেকার তরুণদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প—এই প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য লগ্নীকারী সংস্থা লগ্নীর ৯০ শতাংশ ঋণ হিসাবে ও ১০ শতাংশ প্রান্তিক ঋণ হিসাবে রাজ্য সরকার মঞ্জুর করেন।

(খ) হাতেকলমে কাজ শেখানোর প্রকল্প—হাতেকলমে কাজ শিখে বেকার তরুণ-তরুণীরা, বিশেষ করে যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করে, যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, যথা সীবন-শিল্প, রেডিও মেরামত, বাঁশ ও কাঠের কাজ ইত্যাদিতে অনুদান দেওয়া হয়।

(গ) প্রতিভাসম্পন্ন অভাবী যুবগোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দানের সংস্থানও আছে।

(২) **শিক্ষাগত**

(ক) বিদ্যালয় সমবায়—যার সাহায্যে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা ন্যায্যমূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।

(খ) পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার—সরকারী অনুদানে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এর সাহায্যে পড়াশোনা চালাতে পারে।

(গ) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান। এমনকি অছাত্র তরুণ-তরুণীদেরও শিক্ষামূলক ভ্রমণে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) বিজ্ঞান চেতনা সৃষ্টি—বিজ্ঞানের শিক্ষাকে গ্রামমুখী করা ও বিজ্ঞান চেতনাবোধ জাগ্রত করে সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে যুক্তিবাদী করার উদ্দেশ্যে যুবকল্যাণ দপ্তর স্থানে স্থানে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছে। ব্লক, জেলা, রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য পর্যায়ে বিজ্ঞান আলোচনাচক্র, বিজ্ঞান মেলা ও শিবির ইত্যাদির আয়োজন করেছে।

(ঙ) বয়স্ক-শিক্ষা সম্প্রসারণ—রাজ্যভিত্তিক প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাপর্ষৎ গঠিত হয়েছে।

(৩) **খেলাধুলা**

(ক) ক্রীড়া-প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন—মহকুমা পর্যায়ে গ্রামীন খেলাধূলার উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন ও উপযুক্ত দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ।

(খ) জিমনাসিয়াম তৈরীর প্রকল্প—শরীরচর্চার কাজে উৎসাহ দেবার জন্য রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে জিমনাসিয়াম স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুবকল্যাণ দপ্তর।

(গ) খেলার মাঠ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার প্রকল্প—গ্রামীন খেলাধূলা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ থেকে গ্রামাঞ্চলে খেলার মাঠ তৈরী বা

পুরানো মাঠের সংস্কারের জন্য অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম সরবরাহের জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) পর্বতাভিযান ইত্যাদি দুরূহ দুঃসাহসিক কাজে তারুণ্যকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অভিযান পরিচালনা ও এজন্য একটি সরঞ্জাম-ভাণ্ডার ও পুস্তকাগার গ'ড়ে তোলা হচ্ছে।

(৪) **সাংস্কৃতিক**

(ক) কিশোর-কিশোরীদের চরিত্রগঠন ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার জন্য ভারত স্কাউট, গাইড, ব্রতচারী, মণিমেলা ইত্যাদি সংস্থাকে প্রতিবছরে দেড় লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

(খ) যুব-উৎসব সংগঠন—উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীন খেলা-ধূলা, বিতর্ক, সংগীত, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদির প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, বিভিন্ন শ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যুব-উৎসবের আয়োজন হয় সরকারী খরচে।

(গ) কমিউনিটি হল ও মুক্তাগণ মঞ্চ স্থাপন—সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর জন্য পঞ্চাশ শতাংশ সরকারী সাহায্যে এগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

(ঘ) যুব-আবাস প্রকল্প—বিভিন্ন পরিবেশের সংগে পরিচিত হওয়া, মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সংগে, তাদের সমস্যা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তির গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিভংগীর প্রসার ঘটানোর জন্য রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে যুব-আবাস স্থাপন করেছেন সরকার। এই সব আবাসে সস্তায় স্বল্পকালীন থাকার ব্যবস্থা আছে, এমনকি বিছানাপত্র ও রান্নার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাও আছে। আপাতত আঠারোটি যুব-আবাসে দুশো সত্তরটির মত আসন সংখ্যা রয়েছে[১৫৯]। এছাড়া সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকল্প প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ক্লাব, কিশোর ও যুব সংস্থার সাহায্যে বহুমুখী তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন ও সার্বিক এলাকা উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দিকে দিকে যখন কৈশোর আর যুবশক্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলে যখন যুবফ্রন্ট বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছে, তখন একটা বিস্ময়ের বিষয় হল এই যে পশ্চিমবংগ ছাড়া আর কোন রাজ্যে সরকারী স্তরে

তেমন কোন যুবকল্যাণ প্রকল্প নেই। পশ্চিমবংগের যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে তাই পরিতাপের সংগে বলতে শুনি—"বিগত তিন বৎসর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের যুবসমাজ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগীর, তার গঠনমূলক পরিকল্পনাসমূহকে একটি নীতির মধ্যে সুসংবদ্ধ করে একটি জাতীয় যুবনীতি ঘোষণা করার সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে আসছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে এই নীতি ঘোষণা করানো যায়নি। এই বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে বহুমুখী বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোন যুবকল্যাণ মন্ত্রক বা বিভাগ না থাকা। এমনকি এ রাজ্যের মত অন্য কোন রাজ্যে কোন যুবকল্যাণ বিভাগ না থাকার ফলে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অন্য রাজ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ এই বিভাগের ভাগ্যে জোটেনি" [১৬০]।

বয়ঃসন্ধিকালীন প্রযত্নে বহুমুখী উদ্যোগের এই আবশ্যিকতার সর্বভারতীয় স্তরে উপলব্ধি যত শীঘ্র হয় ততই শুভদায়ক হবে।

২১

উপসংহার

গ্রন্থশেষে এসে মনে হচ্ছে, অনেক কিছুই তো বলা হ'ল, তবু অনেক কথাই না-বলা রয়ে গেল। জীবনের দ্বিতীয় দশক অর্থাৎ দশ থেকে কুড়ি বছর বয়সকে বয়ঃসন্ধির গণ্ডীতে এনে বিচার করা হয়েছে—এই দশকের মধ্যেই পড়ছে বিলাতীমতে যার অভিধা 'টিন-এজ'। এই টিন-এজ বা বয়ঃসন্ধির সমস্যা বিরাট—তার বিরাটত্বের হাজারো দিক। শারীর-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে মূলত আলোচনা করেছি এই বয়সের শারীর-ক্রিয়ার দিকটা, প্রসংগক্রমে এসে গেছে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। বয়ঃসন্ধির শারীরবৃত্ত নিয়ে আলোচনার এই পক্ষপাতিত্ব অন্তত ইস্কাবনকে ইস্কাবন বলার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, এতদিন ধরে নানা জন এই বয়স সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেছেন, নানা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সবগুলোই প্রায় ভাবাবেগপ্রসূত ভাববাদী ধারণামত। বয়ঃসন্ধি যে আসলে মানুষের জীবনের দ্বিতীয় দশকে পৌঁছে এক বিরাট "জৈব রূপান্তর" সেটা প্রথমেই বিশ্লেষণ করা দরকার।

বয়ঃসন্ধির বয়ঃক্রমের প্রথমভাগে অর্থাৎ বাল্য-কৈশোরে এবং দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ কৈশোর-যুব অবস্থায় দেহের হাড়-মাসের বাড় এবং সেইসংগে আন্তর-যন্ত্র সমুচয়ের পরিণতিপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাচ্ছে এই বয়সের বিশেষ চাহিদার ছবি। বিশেষ করে বৃদ্ধি-বিকাশের পশ্চাৎপটে খাদ্য-পুষ্টি প্রসংগে প্রোটিন সংশ্লেষ আর শক্তি উৎপাদন প্রসংগে স্নেহ-শর্করাদির চাহিদার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে আমরা জানতে পেরেছি, বয়ঃসন্ধির পূর্বপ্রান্তে অস্থি-পেশীর আয়তন ও শক্তিবৃদ্ধির অন্তরালে কেমনভাবে রয়েছে যথাযথ পুষ্টি-বিধানের তাগিদ। এ ব্যাপারে সামান্য কার্পণ্যও সহ্য করে না বয়ঃসন্ধির বিকাশশীল শরীর—বৃদ্ধিবৈকল্যের নানা অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকাশ করে তার প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ এড়াতে গেলে করা চাই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প—যার মূলমন্ত্রই হবে, প্রতিরোধ সর্বদাই প্রতিষেধের থেকে অধিকতর কাম্য।

তেমনি বয়ঃসন্ধির উত্তরপ্রান্তীয় বৃদ্ধিবিকাশের পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে—কৈশোরের এই দেহগত পরিবর্তনের সংগে আরো একটি বিশেষ রূপান্তর

এসেছে তার জননশীলতার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। শিশু পরিণত হয়েছে মাতা বা পিতা হবার সম্ভাবনা নিয়ে। দেহের অন্যান্য তন্ত্র যখন বেড়েছে ধীরে ধীরে, বয়ঃসন্ধির উত্তরপ্রান্তীয় কিশোর-কিশোরীর দেহমধ্যে যৌন ও জননতন্ত্র বেড়েছে তখন ত্বরিতগতিতে পিউবার্টির অংগ হিসাবে। আর, সেই সংগে ঘটেছে এই যৌন-জননতন্ত্রীয় পরিণতির বহিঃপ্রকাশ তার গৌণ যৌনচরিত্র-সমূহের প্রস্ফুটনের মাধ্যমে। তার মধ্যে জন্মেছে বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ। দেহ ও মনের সংগঠনে শিশু রূপান্তরিত হয়েছে কিশোর বা কিশোরীতে, যার মধ্যে উপ্ত রয়েছে ভবিষ্যতের বয়স্ক নারী-পুরুষের বীজ। সেই বীজের উপ্তিকালে যথাযথ সিঞ্চন না হলেই ঘটতে থাকে নানা বিকৃতি। তাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত দৈহিক ও মানসিক লালন এই বয়সকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে সহজ পথেই। সুস্থ স্বাস্থ্যশিক্ষা বহু অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও প্রক্রিয়াকে বদলে দিতে পারে, যাতে করে এই বয়সের অনেক দৈহিক-মানসিক বিকৃতিকেই রোখা সম্ভব হয়।

দেহমনের হঠাৎ বিকাশে বয়ঃসন্ধি হয়ে উঠেছে হঠকারী—আর সেই হঠকারিতার শিকার হয়েছে যেমন সে নিজে, তেমনি হয়েছে তার আশে পাশে যারা থেকেছে তারাও। তার রোগব্যাধি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে জটিলতার রূপ নিয়েছে, সেইদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের নজর আনার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। এক অনভিজ্ঞ কিশোর যখন দুরন্তপনায় হাড় ভাঙে, আর এক অনভিজ্ঞা কিশোরী যখন অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব বরণ করে—তখন তাদের দেখতে হবে হঠকারী বয়ঃসন্ধির শিকার হিসাবেই, আর তার সুচিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে হবে সমাজের ছাতার তলায় সে যে সুরক্ষিত, এটা জানানোর জন্য।

তরুণ সমাজ জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ধারা নয়, বরং বলা যায়, বৃহত্তর সমাজের এক আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল ও সৃজনশীল শক্তিমান অংশ। আজকের কিশোর কাল যুবক, পরশু প্রৌঢ়। সুতরাং ভবিষ্যসমাজের এই চালিকাশক্তির অগাধ সামর্থসমুদ্রকে কাজে লাগানোর যে আয়োজন আছে বা হওয়া দরকার, তার আলোচনা বাহুল্য নয়।

শিক্ষানুরাগী ছাত্রের দাবী সমবেদী শিক্ষালয়, ক্রীড়ানুরাগী কৈশোর চায় ক্রীড়ানুশীলনের সুষ্ঠু আয়োজন, অসুস্থ লাজুক কিশোরীর প্রত্যাশা তার চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র পরিবেশে সহানুভূতিশীল চিকিৎসাবিদের সাহায্য, উচ্ছল কর্মশক্তিসম্পন্ন তরুণের চাহিদা যথাযথ কর্মে বিনিয়োগ—এইসব ব্যাপারে

যেসব ব্যবস্থা বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র নিতে পেরেছে, আমার জ্ঞানমত তা সংকলিত করেছি। উপরন্তু এইসব ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গের অবধারণার জন্য পেশ করেছি। বলতে চেয়েছি, কিশোর-শ্রমিকের সুরক্ষার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজে শিক্ষাক্রম, ক্রীড়া-ব্যবস্থা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন বিজ্ঞানসম্মত যৌনশিক্ষা—সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন হয় এই বয়সকে সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ ভেবে।

দৈহিক গঠন নিয়ন্ত্রিত করে মানসিক প্রতিক্রিয়াকে। তাই দেহের বৃদ্ধি-উৎক্ষেপের সংগে ঘটেছে যুবমানসের বিস্ফোরণ। সমাজের সংগে সংঘাত লেগেছে সেই বিস্ফোরণের। সমাজ সচকিত হয়েছে তাই বয়ঃসন্ধিকে নিয়ে। হয় তার নিন্দে করেছে প্রাণ ভরে, নয় তাকে নিয়োজিত করেছে সমাজের নিজের স্বার্থে। কিন্তু তাকে নিয়ে তার স্বার্থে হয়নি বিশেষ কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা। শারীরবিজ্ঞানের দিক থেকে এই সুষ্ঠু পরিকল্পনার দিক-নির্ণয়ের দাবী নিয়ে হাজির হয়েছি দেশ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার—শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী ও রাষ্ট্রনেতাদের দরবারে।

সমগ্র বোদ্ধাসমাজের কাছেও তাই আবেদন জানিয়েছি যে বয়ঃসন্ধির চাপল্যকে তার শারীরিক বাড়ের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে ক্ষমার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তাকে সম্ভাব্য বিপদসমূহ থেকে ত্রাণ করবার জন্যে। পরিবার ও সমাজের অপাংক্তেয় অংশ না ভেবে, অত্যাজ্য অংশ ভেবে বুকে আগলে নিয়ে চলতে হবে এই বয়ঃসন্ধি সমাজকে। বিজ্ঞান সংস্কারমুক্ত করে মানুষকে, তাই মূলত বিজ্ঞানমূলক এই গ্রন্থের শেষে বয়স্কসমাজের কাছে জানাই শারীরবিজ্ঞানীর উদাত্ত আহ্বান—ইহাদের করো আশীর্বাদ ॥

পরিভাষা-নির্ঘণ্ট

(গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের ইংরাজী প্রতিশব্দ)

অংসকূট—acromion
অংসতুণ্ড—coracoid
অকালপক্বতা—precocity
অকালস্তনবিকাশ—premature thelarche
অগ্ন্যাশয়—pancreas
অণ্ডকোষ – testis
অতিপৌরুষ—virlization
অতিবৃদ্ধি—hyperplasia
অতিলোমশতা—hirsutism
অতিসংবেদনশীল—hypersensitive
অতিস্রাব – menorrhagia
অতিস্বেদ—hyperhidrosis
অধর—lower lip
অধিত্বকীয়—subcutaneous
অনুক্রমিত—transmitted
অনুজঙ্ঘাস্থি – fibula
অনুভূমিক—horizontal
অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—ulna
অন্তঃরস—hormone
অন্তঃসত্ত্বা—pregnant
অন্তঃস্রাবী—endocrine
অন্তঃক্ষরা—endocrine
অন্ত্র—intestine
অপপরিণতি—maldevelopment
অপক্রিয়া—dysfunction
অপরাধবোধ—guilt conscience
অপর্যাপ্তস্রাব—oligomenorrhoea
অপুষ্টি—malnutrition
অবতল—concave
অবধারণা—cognition
অবসাদক—depressant
অবিবাহজ মাতৃত্ব—unwed pregnancy
অমরা—placenta
অম্লজান—oxygen
অম্লতামণ্ডিত—acidic
অরজস্বলতা—amenorrhoea
অসমবিকাশ—asymmetry
অস্ত্রোপচার—surgical operation
অস্থি—bone
অস্থিপ্রদাহ—osteitis
অস্থিবিষয়ক—orthopedic
অস্থিযুক্তি—union of epiphysis
অস্থিরূপান্তর—ossification
অস্থিসন্ধি—joint
অক্ষকাস্থি—clavicle
অক্ষপথ—axis
অক্ষিগোলক—eyeball
অক্ষিপট—retina

আক্কেল দাঁত—wisdom tooth
আত্মরতি—auto-eroticism
আদমসুমারী—census

আনুষংগিক যৌনবৈশিষ্ট্য—secondary sexual characteristics
আব—tumour ; growth
আবেগ—emotion
আস্কারা সমাজ—permissive society

উচ্চতা—height
উচ্চরক্তচাপ—hypertension
উত্তল—convex
উত্তেজক—stimulant
উদ্দীপক রস—stimulating hormone
উন্নয়নশীল—developing
উপচিতি—anabolism
উভকামিতা—heterosexuality
উভলিংগত্ব—hermaphroditism
উল্লাস-আবেগ—euphoria

ঊরুর অন্তর্বক্রতা—coxa vera
ঊর্বস্থি—femur

ঋতুকৃচ্ছ্রতা—dysmenorrhoea
ঋতুচক্র—menstrual cycle
ঋতুবন্ধ—amenorrhoea
ঋতুস্রাব—menstruation
ঋতূদ্গম—menarche

ওজন—weight
ওষ্ঠ—upper lip

কণ্ডরা—tendon
কণ্ডূয়ন—itch
কম্পাংক—frequency
করাঙ্গুলিনলক—carpal phalanx
করাঙ্গুলিমূলশলাকা—metacarpal
করোটি—skull
কর্ণপ্রদাহ—otitis
কশেরুকা—vertebra
কক্ষকেশ—axillary hair
কুশ-পা—club-foot
কূর্পরকূট—olecranon
কৃন্তক—incisor
কৃশতা—cachexia
কৈশতন্তু—dendrite
কোষ্ঠবদ্ধতা—constipation
ক্লীবত্ব—eunuchism

খাদ্যহ্রাস—dieting
খিঁচুনী—seizure
খেলাধূলা—sports

গর্ভকালীন বিষক্রিয়া—toxaemia of pregnancy
গর্ভনিরোধ—contraception
গর্ভপাত—abortion
গর্ভবতী—pregnant
গর্ভাধান—conception
গলগণ্ড—goitre
গলবিল—pharynx
গলবিল প্রদাহ—pharyngitis

গুপ্তশুক্রাশয়—cryptorchidism
গৌণ যৌনচরিত্র—secondary sexual character
গ্রন্থি—gland

চক্রাবর্ত—cyclic pattern
চর্বক—premolar
চর্বি—fat
চেরা ওষ্ঠাধর—hare lip
চেরা তালু—cleft palate
চেষ্টীয়—motor
চৈতন্যলোপী—narcotics

ছেদক—canine

জঙ্ঘাস্থি—tibia
জননকোষ—gamete ; germ cell
জননতন্ত্র—reproductive system
জননাংগ—phallus
জনসংখ্যা—population
জনসংযোগ মাধ্যম—publicity media
জন্মগত—congenital
জন্মহার—birth rate
জন্মনিরোধ—birth control
জরায়ু—uterus
জরায়ু-অন্তর্কলা—endometrium
জরায়ুনালী—fallopian tube
জিনবিজ্ঞানী—geneticist
জৈব—biological
জোড়ন—union

ঠোকা হাঁটু—genu valgum

ডমরুক—trochlea
ডিম্বস্ফোটন—ovulation
ডিম্বাণু—ovum
ডিম্বাশয়—ovary
ডিম্বোৎপাদক কলা—graafian follicle

তন্দ্রাচ্ছন্নতা—drowsiness
তরুণ অপরাধী—juvenile delinquent
তরুণাস্থি—cartilage
তারুণ্যশক্তি—youth power
ত্রিকাস্থি—sacrum

দন্তক্ষয়—dental caries
দন্তোদ্গম—dentition
দানবাকৃতি—gigantism
দুগ্ধগ্রন্থি—mammary gland
দেহকাণ্ড—trunk
দ্বিতীয় দশক—second decade ; teen-age
দেহসংঘর্ষমূলক ব্যায়াম—body contact sports

ধর্ষণ—rape
ধাতগত—constitutional

নাসিকা প্রদাহ—rhinitis
নিকটদৃষ্টি—myopia

নিষিক্ত ডিম্বাণু—fertilized ovum
নিষেক—fertilization
নিঃসরণ—secretion
নিস্তেজক—depressant
নৈশস্খলন—nocturnal emission

পরিপক্কতা—maturity
পরিপাক—digestion
পরিসংখ্যান—statistics
পাকস্থলী—stomach
পাদাঙ্গুলিনলক—tarsal phalanx
পার্শ্বপ্রাচীর—lateral wall
পার্শ্ববক্রতা—scoliosis
পুংযৌনরস—androgen
পুংরস—androgen ; testosterone
পুংস্তনস্ফীতি—gynaecomastia
পুনঃসংক্রমণ—reinfection
পুরুষানুক্রম—heredity
পুষ্টি—nutrition
পুষ্টি-প্রযত্ন—nutrition care
পেশক—molar
পেশী—muscle
পোষক রস—tropic hormone
প্রকট-জিন—dominant gene
প্রগণ্ডাস্থি—humerus
প্রচ্ছন্ন-জিন—recessive gene
প্রজন্ম—generation
প্রতিপ্রভ—luminescent
প্রতিবন্ধী—crippled
প্রতিরোধ—prevention
প্রতিষেধ—cure
প্রত্যাবর্তী নিয়ন্ত্রণ—feed-back control
প্রথম মাতৃত্ব - primigravida
প্রবর্তক রস—releasing factor
প্রশান্তক—tranquilizer
প্রশ্বাস—inspiration
প্রাক্‌ঋতু লক্ষণ—premenstrual syndrome
প্রাক্‌প্রসব রক্তপাত—antepartum haemorrhage
প্রাথমিক চিকিৎসা—first aid
প্লীহা—spleen

ফাঁক হাঁটু—genu varum
ফুসফুস—lung

বংশান্বয়—heredity
বন্ধ্যাত্ব—sterility
বয়ঃসন্ধি—adolescence
বয়স্ক—adult
বর্তুলক—pisiform
বলাৎকার—rape
বস্তিকেশ—pubic hair
বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—radius
বহিঃস্তর—cortex
বহির্জননাংগ—external genitalia
বহির্যোনী—vulva
বহুঅংগুলিত্ব—polydactylism
বামনত্ব—dwarfism

বাহ্যার্বুদ—lateral epicondyle
বিকাশ—development
বিদ্যুল্লেখ—electrogram
বিপাক—metabolism
বিভ্রান্তক—illusinogenic
বিশোষণ—absorption
বিষমদৃষ্টি—astigmatism
বীজকোষ—zygote
বীর্য—semen
বৃক্ক—kidney
বৃক্কপ্রদাহ—nephritis
বৃদ্ধি—growth
বৃদ্ধি-উৎক্ষেপ—growth spurt
বৃদ্ধিপোষক রস—somatotropin
বৃদ্ধিহার—growth rate
বৈকল্য—disorder
বৈষম্য—imbalance
ব্যাধি—disease
ব্যায়ামবিদ—athelete
ব্রণ—acne vulgaris

ভগাংকুর—clitoris
ভগাস্থি—pubis
ভবিষ্যাভাস—prognosis
ভ্রূণ—embryo ; foetus
ভ্রূণতত্ত্ব—embryology

মতদান—voting
মধুমেহ—diabetes mellitus
মধ্যকক্ষ কর্ণপ্রদাহ—otitis media
মনঃপ্রভাবী ঔষধ—psychodelic
মনোবিজ্ঞান—psychology
মনোবিজ্ঞানী—psychologist
মস্তিষ্ক—brain
মহাশিখরক—greater trochanter
মাদকনির্ভরতা—drug dependance
মাদকাসক্তি—drug addiction
মানসিক ক্ষুধামান্দ্য—anorexia nervosa
মাসিক—menses
মুখমণ্ডল—face
মুষ্কথলি—scrotum
মূত্রকৃচ্ছ্রতা—dysuria
মূত্রতন্ত্রীয়—urological
মূত্রথলি—urinary bladder
মূত্রথলি প্রদাহ—cystitis
মৃগী—epilepsy
মৃতবৎসতা—still-birth
মেদ—fat
মেরুদণ্ড—spine

যকৃত—liver
যক্ষ্মা—tuberculosis
যুগ্মযন্ত্র—paired organ
যুব—youth
যুব মধুমেহ—juvenile diabetes
যোনী—vulva
যোনীনালী—vagina
যোনী বহিরোষ্ঠ—labia majora
যৌনগ্রন্থি—gonad

যৌনগ্রন্থি-উদ্দীপক—gonadotropins
যৌনজ রোগ—venereal disease
যৌন-পরিতৃপ্তি—orgasm
যৌনবিকৃতি—sexual perversion
যৌনযথেচ্ছাচার—promiscuity
যৌনরস—sex hormones
যৌনশিক্ষা—sex education
যৌন-সংগম—coitus ; copulation
যৌন-সাহিত্য—pornography
যৌনাচরণ—sex behaviour
যৌনোদ্গম—puberty

রক্তকণিকা—blood corpuscle
রক্তচাপ—blood pressure
রক্তসংবহনতন্ত্র—cardiovascular system
রক্তাল্পতা—anaemia
রজোপ্রবৃত্তি—menarche
রজোস্রাব—menstruation
রঞ্জনছায়া—skiagraphy
রঞ্জনরশ্মি—X-ray
রতিচূড়া—mount of Venus
রতিসুখ—orgasm
রাজনীতি—politics
রাষ্ট্রনীতিক—politician
রেতঃ—semen
রেতঃস্খলন—ejaculation

লঘুশিখরক—lesser trochanter
লসিকাতন্ত্র—lymphoid system
লিংগ—sex ; phallus ; external genitalia
লোকগণনা—census

শর্করা—carbohydrate
শল্যচিকিৎসা—surgery
শল্যচিকিৎসাবিদ্—surgeon
শারীরবিজ্ঞান—physiology
শারীরশিক্ষা—physical training
শিশ্ন—penis
শুক্র—semen
শুক্রকীট—spermatozoon
শুক্রনালী—seminiferous tubules
শুক্রনিক্ষেপণ—ejaculation
শুক্রস্থলী—seminal vesicle
শুক্রাণু—sperm
শুক্রাশয়—testis
শৈথিল্য—relaxation
শৈশবত্ব—infantilism
শোধনাগার—reformatory ; Borstal school
শ্রোণি—pelvis
শ্রোণিগহ্বর—pelvic cavity
শ্রোণিচক্র—pelvic girdle
শ্রোণিপ্রকোষ্ঠ—pelvic cavity
শ্রোণিফলক—ilium
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি—mucous membrane
শ্বদন্ত—canine tooth
শ্বসনতন্ত্র—respiratory system

শ্বসনহার—rate of respiration
শ্বেত প্রদর—leucorrhoea
সংক্রমণ—infection
সংগমক্লেশ—dyspareunia
সংঘর্ষবিহীন ব্যায়াম—noncontact sports
সংঘর্ষসম্ভব ব্যায়াম—collision sports
সংজ্ঞা—definition
সংজ্ঞাবহ—sensory
সংবেদনশীল—sensitive
সংশ্লেষ—synthesis
সতীচ্ছদ—hymen
সন্ধি—joint
সমকামিতা—homosexuality
সমাজবিজ্ঞান—sociology
সমানুপাতিক—proportional
সুষম খাদ্য—balanced food
সৌন্দর্যবিধায়ক—cosmetic
স্তনবৃন্ত—nipple
স্তনবৃন্তবলয়—areola
স্তনমুকুল—breast bud
স্তনস্ফীতি—mastitis
স্ত্রীরোগ—gynaecological disorder
স্থূলতা—obesity
স্নায়ুতন্ত্র—nervous system
স্নেহ—fat
স্নেহগ্রন্থি—sebaceous gland
স্বমৈথুন—masturbation
স্বরযন্ত্র—larynx
স্বাস্থ্য-প্রযত্ন—health care
স্বাস্থ্য-বিধান—health service
স্বাস্থ্যশিক্ষা—health education
স্বেদ—sweat
স্বেদগ্রন্থি—sweat gland
হাঁপানী—asthma
হৃৎ-তাল—heart rate
হৃৎপিণ্ড—heart
হৃদ্‌রোগ—cardiac disorders
ক্ষয়রোগ—phthisis, tuberculosis
ক্ষরণ—secretion
ক্ষারতাসমন্বিত—alkaline
ক্ষুধামান্দ্য—anorexia.

আকরসূচী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সবুজের অভিযান, বলাকা ॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। ১৩৫৭
২। সুকান্ত ভট্টাচার্য। আঠারোর গান, ছাড়পত্র ॥ সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা। ১৩৫৭
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছুটি, গল্পগুচ্ছ ॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। ১৯৫৭
৪। D. C. Smith and G. R. Rice. Community Aspects of Pediatric Practice. *Pediatrics.* (Ed. H. C. Barnett & A. H. Einhorn). Appleton-Century-Crofts Inc., New York. 1972.
৫। গঠনতন্ত্র, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ॥ কলিকাতা। ১৯৭৯
৬। চাণক্য সেন। পুত্র পিতাকে ॥ প্রকাশ ভবন, কলিকাতা। ১৯৭৭
৭। স্বস্নাত দাস। পাঠকের মতামত, যুগান্তর ॥ ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮০
৮। Constitution of the Indian Youth Congress. West Bengal Youth Congress. Mahajati Sadan, Calcutta. June, 1966.
৯। Constitution of Chhatra Parishad. West Bengal Chhatra Parishad. Mahajati Sadan, Calcutta.
১০। জ. দ.। কোমল ক্যাকটাস, যুগান্তর ॥ ১২ জানুয়ারী, ১৯৮১
১১। যুব সংগ্রাম ॥ প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১২, ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৭১।
১২। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ ॥ সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী। ১৯৬৬
১৩। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সংকলিত ও সম্পাদিত)। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৯১৬
১৪। Webster. A Dictionery of the English Language. G. Bell & Sons, London. 1916.
১৫। রাধাকান্ত দেব। শব্দকল্পদ্রুমঃ ॥ কালীপ্রসন্ন শর্মণা সংস্কৃতঃ প্রকাশিতশ্চ, কলিকাতা। ১৮৬৭

১৬। কবিরাজ কালীপ্রসন্ন কবিশেখর (অনুবাদিত ও সংশোধিত)। সুশ্রুত সংহিতা (সূত্রস্থানম্) ॥ বেণীমাধব ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা। ১৮৯৮

১৭। B. Jowett (Translated). *The Republic of Plato*, and, *The Dialogues of Plato*. Clarendon Press, Oxford. 1921 and 1953.

১৮। J. A. Comenius. *The Great Didactic* (Tr. M. W. Keating). A. C. Black, London. 1923.

১৯। G. S. Hall. *Adolescence*: Its Psychology and its Relation to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. D. Appleton, New York. 1904.

২০। Margaret Mead. *Coming of Age in Samoa*. Morrow. 1961.

২১। Indian Majority Act (Act IX of 1875).

২২। D. D. Basu. *Constitutional Law of India*, Article 326. Prentice Hall of India, New Delhi. 1977.

২৩। Child Marriage Restraint Act (Act XIX of 1929— Amended by Act 41 of 1949, further amended by Act 2 of 1978).

২৪। Employment of Children Act. (Act 26 of 1938— Amended by Act 48 of 1951).

২৫। S. Kaul. Estimation of Age from Emergence of Permanent Teeth. *Indian Paediatrics*. Vol. 13, P. 233, 1976.

২৬। K. L. Schowrie. Eruption of Teeth in India. *Indian Journal of Medical Research*. Vol. 34, P. 105, 1946.

২৭। N. J. Modi (Ed). *Modi's Text Book of Medical Jurisprudence and Toxicology*. N. M. Tripathi Pr. Ltd, Bombay. 1977

২৮। G. Galstaun. A Study of Ossification as Observed in Indian Subjects. *Indian Jour. Med. Res.* Vol. 25, P. 267, 1937.

২৯। कविः गणनाथ सेन। प्रत्यक्षशारीरम्॥ राखालदास सेन काव्यतीर्थेन कलिकाता महानगरतः प्रकाशितः। १८१३

৩০। M. D. Kogut. *Pediatric Clinics of North America.* Vol. 20, P. 780, 1973.

৩১। J. M. Tanner. *Growth and Endocrinology of Adolescence. Endocrine and Genetic Diseases of Childhood.* W. B. Saunders, Philadelphia & London. 1969.

৩২। J. C. Sarma. *Physical Growth and Development of the Maharastrians.* Ethnographic & Folk Culture Society, Lucknow. 1970.

৩৩। W. A. Marshall and J. M. Tanner. *Arch. Dis. Child.* Vol. 44, P. 291, 1969.

৩৪। W. A. Marshall and J. M. Tanner. *Arch. Dis. Child.* Vol. 45, P. 13, 1970.

৩৫। J. C. Boileau Grant and J. V. Busmajian. *Grant's Method of Anatomy.* Scientific Book Agency, Calcutta. 1965.

৩৬। M. S. Madan and V. B. Saxena. *Arch. Child Health.* Vol. 17, P. 153, 1975.

৩৭। A. Espenschade. Motor Performances in Adolescence. *Monogr. Soc. Res. Child. Dev.* Vol. 5, No. 1, 1940.

৩৮। D. B. Cheek. *Human Growth, Body Composition, Cell Growth, Energy and Intelligence.* Lea & Febiger, Philadelphia. 1968.

৩৯। E. E. Maccoby and C. M. Jacklin. *The Psychology of Sex Differences.* Stanford University Press. 1974.

৪০। D. Sinclair. *Human Growth after Birth.* Oxford University Press, London. 1973.

৪১। R. E. Scammon. The Measurement of the Body in Childhood. *The Measurement of Man* (Ed. J. A. Harris, C. M. Jackson, D. G. Patterson & R. E. Scammon). University of Minnesota Press. 1930.

৪২। M. M. Maresh. *Pediatrics.* Vol. 2, P. 382, 1948.

৪৩। A. Iliff and V. A. Lee. *Child. Dev.* Vol. 23, P. 237, 1952.

৪৪। F. A. Beach. Human Sexuality and Evolution. *Reproductive Behavior.* (Ed. W. Montagna & W. A. Sadler). Plenum Press, New York. 1974.

৪৫। B. G. Ferris and C. W. Smith. *Pediatrics.* Vol. 12, P. 341, 1953.

৪৬। J. A. Douvis and J. Dobbling (Ed.). *Scientific Foundation of Pediatrics.* William Heinemann Medical Books, London. 1974.

৪৭। J.M. Tanner. Physical Growth. *Carmichael's Manual of Child Psychology* (Ed. P. H. Mussen). Vol. 1. John Wiley & Sons, New York & London. 1970.

৪৮। A. C. Kinsey, W. B. Pomeroy and C. E. Martin. *Sexual Behavior in the Human Male.* W. B. Saunders, Philadelphia. 1948.

৪৯। W. A. Marshall and J. M. Tanner. Puberty. *Scientific Foundations of Pediatrics* (Ed. J. A. Douvis & J. Dobbling). William Heinemann Medical Books, London. 1974.

৫০। C. S. Ford and F. A. Beach. *Patterns of Sexual Behavior.* Harper & Row, New York. 1951.

৫১। S. Bhatnagar and B. D. Malhotra. *Journal of Obstetrics and Gynaecology of India.* Vol. 26, P. 128, 1976.

৫২। J. Robertson. *Edin. Med. Jour.* Vol. 64, P. 156, 1845.

৫৩। M. Gupta. *Webb's Pathologica Indica.* 1848.

৫৪। D. F. Gujral. *Indian. Jour. Med. Res.* Vol. 8, P. 366, 1920.

৫৫। G. Rakshit. *Man of India.* Vol. 40, P. 52, 1954.

৫৬। M. V. Seetha. *Jour. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 8, P. 74, 1957.

৫৭। D. Banerjee and S. P. Mukherjee. *Journal of Indian Medical Association.* Vol. 37, P. 261, 1961.

৫৮। T. Sen. *Indian Journal of Anthropological Society.* Vol. 10, P. 173, 1975.

৫৯। F. Flint. *Jour. Indian Med. Assocn.* Vol. 66, P. 20, 1976.

৬০। H. Katchadourian. *The Biology of Adolescence.* W. H. Freeman and Company, San Francisco. 1977.

৬১। J. M. Tanner. *Growth at Adolescence.* Blackwell Scientific Publishers, Oxford. 1962.

৬২। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। **বৈষ্ণব পদাবলী**॥ সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা। ১৯৮০

৬৩। D. B. Cheek. *Growth and Growth Retardation with Particular Reference to the Endocrine, Cardiac and Normal Child.* Lea & Febiger, Philadelphia. 1967.

৬৪। F. M. Kenny, G. P. Gancayco, F. P. Heald and W. Hung. *J. Clin. Endocrinol.* Vol. 26, P. 1232, 1966.

৬৫। G. Bermant and J. M. Davidson. *Biological Basis of Sexual Behavior*. Harper & Row, New York. 1974.

৬৬। C. Fairman and J. S. D. Winter. Gonadotropins and Sex Hormone Patterns in Puberty. *Control of the Onset of Puberty*. (Ed. M. M. Grumbach & F. F. Mayer). John Wiley & Sons, New York & London. 1974.

৬৭। D. Knorr, F. Bidlingmaier, O. Butenandt, H. Fendel and R. Ehrt-Wehle. *Acta Endocrinol.* Vol. 75, P. 181, 1974.

৬৮। J. Money. Sex Hormones and Other Variables in Human Eroticism. *Sex and Internal Secretions*. (Ed. W. Young). Vol. 2. Williams & Wilkins Co., Baltimore. 1961.

৬৯। A. W. Root. *Jour. Pediatr.* Vol. 83, P. 1, 1973.

৭০। महाकवि श्रीकालिदास विरचितम्। मेघदूतम्॥ श्रीयुक्त हरिदास सिद्धान्तवागीशभट्टाचार्येण प्रणीतया हिन्दीबङ्गानुवादाभ्याञ्च समेतम्॥ सिद्धान्तविद्यालयात् प्रकाशितम्। १८६१ शकाब्द।

৭১। C. Gemzell and P. Roos. The Physiology and Chemistry of Follicle-stimulating Hormones. *The Pituitary Gland*. (Ed. G. H. Harris & B. T. Donovan). Vol. 1. University of California Press. 1966.

৭২। J. Tepperman. *Metabolic and Endocrine Physiology*. Yearbook Medical Publishers Inc., Chicago. 1968.

৭৩। নীললোহিত। সতেরো বছর বয়সে॥ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা। ১৩৮৬

৭৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন॥ অগ্রহায়ণ ১২৭৯

৭৫। R. H. Moos. *Amer. Jour. Obstet. Gynecol.* Vol. 103, P. 390, 1969.

৭৬। শংকর। ছেলেমেয়েরা, যেখানে যেমন॥ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা। ১৯৭৪

৭৭। J. P. Semmens and J. H. Semmens. *Ped. Clin. North Amer.* Vol. 19, P. 765, 1972.

৭৮। A. C. Kinsey, W. B. Pomeroy and C. E. Martin. *Sexual Behavior in the Human Female.* W. B. Saunders, Philadelphia. 1953.

৭৯। Norman Jeffcoate. *Principles of Gynaecology.* Butterworths, London & Boston. 1975.

৮০। R. H. Williams (Ed.). *Textbook of Endocrinology.* W. B. Saunders, Philadelphia. 1974.

৮১। F. P. Heald and M. A. Kahn. *Ped. Clin. North Amer.* Vol. 20, P. 807, 1973.

৮২। E. P. Paulsen. Obesity in Children and Adolescents. *Pediatrics.* (Ed. H. L. Barnett & A. H. Einhorn). Appleton-Century-Crofts Inc., New York. 1972

৮৩। V. A. McKusuk. *Mendelian Inheritance in Man.* Bull. John Hopkins Press. 1971.

৮৪। A. M. Bongiovanni. Sexual Precocity. *Pediatrics.* (Ed. H. L. Barnett & A. H. Einhorn). Appleton-Century-Crofts Inc., New York. 1972.

৮৫। H. Jolly. *Sexual Precocity.* Charles C. Thomas, Springfield. 1955.

৮৬। J. Money and D. Alexander. *J. Nerv. Ment. Dis.* Vol. 148, P. 111, 1969.

৮৭। A. Prader. Growth and Development. *Clinical Endocrinology.* (Ed. A. Lobhart). Springer-Verlag, Berlin & New York. 1974.

৮৮। M. Schofield. *The Sexual Behavior of Young People.* Little Brown & Co., Boston & Massachusettes. 1967.

৮৯। M. Zelint and J. E. Kantner. *Soc. Sci. Res.* Vol. 1, P. 335, 1972.

৯০। J. H. Blount, W. N. Darrow and R. E. Johnson. *Ped. Clin. North Amer.* Vol. 20, P. 1021, 1973.

৯১। R. Rajana. *Medical Times.* Sandoz, Bombay. Vol. VI, 1976.

৯২। P. M. Dongre and P. V. Advant. Venereal Diseases among Students. *Maharastra Medical Journal.* Vol. 22, P. 47, 1975.

৯৩। S. C. Kundu, S. Majumdar, A. K. De and D.K. Pal. *Journal of Association of Physicians of India.* Vol. 21, P. 221, 1973.

৯৪। C. F. Burgoon, Jr. Acne Vulgaris. *Nelson Textbook of Pediatrics.* (Ed. V. C. Vaughan & R. J. McKay). W. B. Saunders, Philadelphia. 1975

৯৫। A. Goswami, E. Ahmed, P. L. Saha and I. S. Roy. *Jour. Indian Med. Assoc.* Vol. 72, P. 227, 1979.

৯৬। N.N. Roy Chowdhury and M. Sanyal. Gynecological Problems in Childhood and Adolescence. *J. Indian Med. Assoc.* Vol. 65, P. 179, 1975.

৯৭। W. Fernandes and K. Subramanyan. Gynecological Problems in Teen-agers. *J. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 21, P. 54, 1971.

৯৮। A. E. Rakoff. Endocrine Mechanisms in Psychogeenic Amenorrhoea. *Endocrinology and Human Behaviour.* (Ed. P. P. Michael). Oxford University Press, London. 1968

৯৯। W. G. Povey. *Clin. Obstet. Gynec.* Vol. 13, P. 477, 1970.

১০০। C. J. Dewhurst. *Gynaecological Disorders of Infants and Children.* Cassel, London. 1963.

১০১। S. Chandrasekhar. *Family Planning News.* Vol. 8, P. 10, 1967.

১০২। R. N. Nag. *Journal of Vivekananda Institute of Medical Sciences.* Vol. 1, P. 55, 1978.

১০৩। S. L. Israel and T. B. Wontersz. *Amer. Jour. Obstet. Gynec.* Vol. 85, P. 659, 1963.

১০৪। J. F. Clerk. *Obstet. Gynec. News.* Vol. 5, P. 35, 1970.

১০৫। N. Ghosh and B. Ghosh. *J. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 26, P. 722, 1976.

১০৬। J. A. Grant and F. P. Heald. *Clin. Pediatr.* Vol. 11, P. 567, 1972.

১০৭। J. L. Ranh, L. B. Johnson and R. L. Burket. *Ped. Clin. North Amer.* Vol. 20, P. 1005, 1973.

১০৮। Medical Termination of Pregnancy Act. (Act XXXIV of 1971).

১০৯। K. Bhaskar Rao and P. E. Mallika. *J. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 26, P. 25, 1976.

১১০। M.A. Desmukh, C.M. Alwani and V.N. Purandare. *J. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 26, P. 34, 1976.

১১১। V. N. Purandare, R. F. Chaudhary, V. B. Raote and W. R. Krishna. *J. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 29, P. 302, 1979.

১১২। N. N. Roy Chowdhury and K. Mukherjee. *J. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 29, P. 308, 1979.

১১৩। S. Dutta, P. K. Das Gupta and A. Ghosh. *J. Obstet. Gynaec. India.* Vol. 29, P. 969, 1979.

১১৪। R. U. Hausknecht. *Ped. Clin. North Amer.* Vol. 19, P. 803, 1972.

১১৫। Children and Young Persons Act of 1969 (U. K.)

১১৬। West Bengal Children Act. (Act LX of 1960 —Amended by Act 15 of 1978).

১১৭। E. Warner. *Time Magazine.* 11 July, 1977.

১১৮। R. S. Illingworth. *The Child at School.* Blackwell Scientific Publishers, Oxford. 1974.

১১৯। C. B. I. Report on Crimes in India (1966). Government of India Publication. 1968.

১২০। Bureau of Police Research and Development. Report, 1973.

১২১। Gazette of India. Extra. Pt. II. Sec. 2, P. 1487. 1959.

১২২। Report of the Association of Social Health in India. *The Statesman, Calcutta.* 8 October, 1978.

১২৩। F. C. Koller. *Chromosomes and Genes.* Oliver & Boyd, Edinburg. 1968.

১২৪। R. N. Nag. *Calcutta Medical Journal.* Vol. 74, P. 59, 1977.

১২৫। J. S. Tamerin. *Arch. Gen. Psychiat.* Vol. 28, P. 116, 1973.

১২৬। Smoking on Health. Report of the Royal College of Physicians, London. 1977

১২৭। C. Isles. *Amer. Heart Jour.* Vol. 99, P. 538, 1980.

১২৮। P. K. Banerjee. Presidential Address, Section of Medical & Veterinary Sciences. *Proceedings of the 68th Session of Indian Science Congress.* 1981.

১২৯। J. M. Puliyel, R. K. Agarwal and M. Chausoria. *Proc. XVIII National Conference of Indian Academy of Pediatrics.* Hyderabad. 1981

১৩০। আনন্দবাজার পত্রিকা ॥ ১৬ নভেম্বর, ১৯৮০
১৩১। Indian Institute of Social Welfare and Management. Report, 1979.
১৩২। D. Mohan and A. Arora. Prevalence and Pattern of Drug Abuse among Delhi University College Students. *J. Indian Med. Assoc.* Vol. 66, P. 28, 1976.
১৩৩। P. K. Banerjee. *Cal. Med. Jour.* Vol. 73, P. 69, 1976.
১৩৪। M. E. Chafetz. Alcoholism and Alcoholic Psychoses. *Comprehensive Text Book of Psychiatry*. (Ed. A.M. Feedman, H. I. Kaplan & B. J. Sadock). Vol. 2. Williams & Wilkins, Baltimore. 1975.
১৩৫। অজয়কুমার শর্মা। মাদক প্রবণতা, মন্থন ॥ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৯, ১৩৮৭
১৩৬। Dangerous Drug Act (Act II of 1930).
১৩৭। Opiate of the Masses. *The Statesman*, Calcutta. 2 June, 1977.
১৩৮। J. F. Kraus, R. S. Riggins and C. E. Franti. *Amer. Jour. Epidemiol.* Vol. 102, P. 99, 1975.
১৩৯। অনুপকুমার দত্ত। খেলার আসর ॥ বর্ষ ৪, সংখ্যা ৪০, পৃঃ ২৬। ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১
১৪০। বামফ্রন্ট সরকার এবং ছাত্র ও যুবসমাজ ॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮ আগষ্ট, ১৯৮০
১৪১। T. E. Schaffer. *Ped. Clin. North Amer.* Vol 20, P. 837, 1973.
১৪২। D. C. Cooper. *Jour. Amer. Med. Assoc.* Vol. 221, P. 1007, 1972.
১৪৩। আনন্দবাজার পত্রিকা ॥ ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮১
১৪৪। আনন্দ সেনগুপ্ত। দেশ ॥ ৪৮ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, পৃঃ ৩। ১৫ আগষ্ট, ১৯৮১

১৪৫। Convention no. 90. International Labour Conference. 31st Session, 1948.

১৪৬। The Slave Children of Mandasaur. *Sunday*. 14 December, 1980.

১৪৭। *Employment Review (1976-77)* Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour, Government of India. New Delhi. 1980

১৪৮। *Employment Review (1972-73)*. Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour, Government of India. New Delhi. 1974.

১৪৯। *Quarterly Employment Review, West Bengal*. Directorate of National Employment Service, West Bengal. Calcutta. June, 1977.

১৫০। Data obtained through the courtesy of the Directorate of National Employment Service, Government of West Bengal. (Personal Communication).

১৫১। লিওনিদ ব্রেজনেভ। কমিউনিজমের যাত্রাপথে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়। **শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র** ॥ বর্ষ ৫, সংখ্যা ১২, পৃঃ ১৬। ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

১৫২। *National Employment Service Manual*. Vol. I. Directorate of Employment Exchange, Ministry of Labour (D. G. E. & T.), Government of India. 1978.

১৫৩। Careers Information Services. Career Study Centre, Central Institute for Research & Training in Employment Service (D. G. E. & T.), Government of India. Pusa, New Delhi.

১৫৪। R. N. Nag. *Adolescents in India*. Medical Allied Agency, Calcutta. 1982.

১৫৫। K. T. Acharya. *Proceedings of the Indian Science Congress*. 1975-76.

১৫৬। V. N. Patwardhan. *ICMR Sp. Report*, No. 35. 1960.

১৫৭। P. K. Rao. *Diet Manual II*. Government of Maharastra, Bombay. 1961.

১৫৮। Data obtained through the courtesy of the Youth Service Department, Government of West Bengal. (Personal Communication).

১৫৯। আমরা—প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা ॥ যুবকল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮১।

১৬০। Kanti Biswas, Minister of State-in-Charge, Youth Service Department, West Bengal. *Budget Speech (1981-82)*. Calcutta. 25 March, 1981.

বিষয় নির্দেশিকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও তার প্রতিষেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৫·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭·০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। মানুষের মন/অরুণ কুমার রায়চৌধুরী
৬। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়
৮। হাঁপানি রোগ/মনীষ প্রধান
৯। ১০৩টী মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু

নয় টাকা